লুকোচুরি

শুজা রশীদ

অনন্যা প্রকাশনী

এক

বিচ্ছুগুলির সাথে মোর্শেদের প্রথম পরিচয় হয় মধুমিতায়। বেনহার দেখতে গিয়ে। দুটি টিকিট কেটে চারজন হলে ঢুকেছিল তারা। লাইটম্যান হম্বি–তম্বি করায় তাকে খুন করে গুম করে ফেলার হুমকি দিয়েছিল। লাইটম্যানের সম্মানবোধ তীক্ষ্ণ। সে অনতিবিলম্বে দলভারি করে ফিরে এলো।

–এই যে ভাইয়েরা, যাদের টিকিট নেই, তারা বাইরে যান।

–না যাবো না। কি করবি তুই?

–কি করবো মানে? আপনারা টিকিট না কেটে ঢুকবেন কেন?

–ঢুকেছি তো কি হয়েছে! ক্ষতি হলে মালিকের হবে। তোদের কি?

–অতো কথা বুঝি না। এক্ষুণি বেরিয়ে যান।

সামনের ষণ্ডামার্কা ছেলেটি রে-রে করে তেড়ে যাচ্ছিলো, তার হাত চেপে ধরলো মোর্শেদ।

–তোমরা কজন টিকিট কাটোনি?

ছেলেটি একটু ইতস্তত করলো। ভদ্রলোকটিকে সে হলের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলো।

–দুজন।

–চমৎকার! আমি তিনটে টিকিট কেটেছিলাম। আমার বন্ধু দুজন আসেনি। তোমরা ওদের সীটে বসে পড়ো।

ছেলে দুটি বুক ফুলিয়ে আসন গ্রহণ করলো। যেন এমনটি যে হবে তা তাদের জানাই ছিল।

দ্বিতীয়বার দেখা হয় জাদুঘরে। তারা দুজন তিনটি সুসজ্জিতা সুন্দরী মেয়ের পিছু পিছু টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিলো। মেয়ে তিনটির অভিব্যক্তি রহস্যময়, তারা কখনো আড় চোখে পিছু ফিরে মিষ্টি মিষ্টি হাসছে, কখনো আবার অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে আবক্ষ উন্মুক্ত প্রাচীন নারী মূর্তি দেখছে। ছেলেগুলি চোখ মুখ উজ্জ্বল করে মধুর সম্ভাষণ প্রয়োগ করতে শুরু করলো। ফলাফল স্বভাবতই তিক্ত। সুন্দরীদের অগ্রজেরা এসে চোখ রাঙালেন। বিচ্ছুগুলি জিভ ভ্যাঙচালো। মেয়েগুলি সমস্বরে অভিযোগ জানালো। –সেই তখন থেকে পিছু লেগে আছে, ভাইয়া।

–এই তোমরা আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসোনি?

–আমরা আবার কখন হাসলাম? হাসতে আমাদের বয়েই গেছে!

–খবরদার, মিথ্যা কথা বলবে না।

–দেখেছো ভাইয়া, কেমন চোখ রাঙাচ্ছে?

ষণ্ডামার্কা ছেলেটির নাম রাসেল, সে শার্টের হাতা গুটিয়ে, কোঁকড়া চুলে দুই ঝাঁকি দিয়ে ঘুষি পাকালো। মার–মার কাট কাট পরিস্থিতি। মোর্শেদকে একরকম বাধ্য হয়েই নাক গলাতে হলো।

–আরে রাসেল, তোমরা!

–মোর্শেদ ভাই। কেমন আছেন?

–ভালো, বেশ ভালো। আচ্ছা ঈশা খাঁর আমলের তাল গাছ মার্কা তলোয়ারগুলো কোথায় বলতে পারবে? সেগুলো শুনেছি দারুন জবরজং চিজ!

খুক খুক করে কাশলো রাসেল–জ্বি তলোয়ার?

মেয়ে তিনটি সমস্বরে বললো–ঐ তো ওদিকে।

–তোমরা থামো। দুটি ছেলে একযোগে ধমকে উঠলো।

–ইস, থামবো কেন? আমরা কি তোমাদের সাথে কথা বলছি?

মোর্শেদ এক রকম ঠেলেই ছেলেগুলিকে সরিয়ে আনলো। –চলো, চলো, তলোয়ারগুলো দেখে আসি। এক একটা নাকি দশ ফুট লম্বা।
রাসেল পিছু ফিরে আধ হাত জিভ ভ্যাঙচালো। মেয়েগুলি সমবেতভাবে প্রত্যুত্তর দিলো। মোর্শেদ হেসে ফেললো।

তৃতীয়বার দেখা হয় ঢাকা স্টেডিয়ামে। ছেলেগুলি প্রচণ্ড শোরগোল তুলে আবাহনীর পিণ্ডি চটকাচ্ছিলো। যদিও মাঠে বেচারী আবাহনীর কোন নাম গন্ধ নেই, কারণ খেলা হচ্ছে মোহামেডান ও রহমতগঞ্জের মধ্যে। মোর্শেদকে দেখেই তারা গালভরা হাসি দিলো।
–কেমন আছেন মোর্শেদ ভাই? আপনি মোহামেডানের সাপোর্টার নাকি?
–আমার বাপ-দাদা চৌদ্দগুষ্ঠি মোহামেডানের সাপোর্টার।
–বলেন কি! আমাদের কিন্তু মোটে দুপুর ষ।
–চিন্তার কিছু নেই। দুইও যা চৌদ্দও তাই, সমর্থনটাই বড় কথা। কিন্তু আজতো মোহামেডানের কপালে খারাবি আছে মনে হচ্ছে। বেটাছেলেরা পাস্তা খেয়ে মাঠে নেমেছে? হাফ টাইমের সময় এলো, অথচ এখন পর্যন্ত একটা গোলের ছায়া মাত্র নেই।
–শালারা আজকে ড্র করেই দেখুক না, ঠ্যাঙ কেটে মোরব্বা বানাবো। প্রত্যেক খেলায় পয়েন্ট লস করবে, ইয়ার্কি পেয়েছে নাকি? শালার ব্যাটা কায়সার হামিদের মুণ্ডু চটকাই . . .
এই সুললিত সম্ভাষণ কয়েকজন কায়সার প্রেমিককে উত্তপ্ত করে তুললো। –কেন, কায়সার হামিদের কি দোষ? সে বেচারাতো জান–প্রাণ দিয়ে খেলছে।
–ঘোড়ার ডিম খেলছে। গত খেলায় ও যদি ফাল দিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে না থাকতো তাহলে কখনো গোলটা শোধ হতো? জেতা খেলা ড্র করিয়ে দিলো বেটাছেলে।
–ফালতু কথা বলো না। তোমরা খেলার কি বোঝ?
–অ, আমরা খেলার কিছু বুঝি না, আর তোরা ব্যাটা সব বুঝিস? পিটিয়ে পিঠের ছাল-চামড়া সমান করে দেবো।
মোর্শেদের শরীরে সর্বসাকুল্যে পাঁচটি ছাতির বাড়ি পড়েছিলো, এক হালি পিঠে, একটি কপালে। দিন পাঁচেক কপাল ফুলে ঢোল হয়ে থাকলো।
চতুর্থবার দেখা হয় ইসলামপুর। মোর্শেদ পিতৃপ্রদত্ত কাপড়ের দোকানখানির সেলস কাউন্টারে ব্যাজার মুখে বসেছিলে। ছেলেগুলি তিনটি প্রাচীন মডেলের মোটর সাইকেলে সাইক্লোন তুলে সামনের দোকানটিতে এসে থমকে দাঁড়ালো।
–আরে, রাসেল, জাকের, তোমরা এখানে?
–আমরা রঞ্জনের বন্ধু। ওর সাথে আড্ডা দিতে এসেছি।
–সামনের দোকানটি নিশীথ বাবুর। রঞ্জন তার বড় ছেলে।
–বেশ হলো। আমারও দোকানে চুপচাপ বসে থাকতে ভালো লাগে না। সবাই মিলে বেশ আড্ডা দেয়া যাবে। রঞ্জনকে নিয়ে আমার দোকানে চলে এসো। এই সেলিম, জলদি যা, খান আষ্টেক কোক আর পেটিস নিয়ে আয়। যাবি আর আসবি।
–মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই মোর্শেদ এই অসমবয়সী বিচ্ছু স্বভাবের ছেলেগুলির সাথে একাত্ম হয়ে গেলো।
গাড়িটি মসৃণ গতিতে এগিয়ে এসে রাস্তার পাশ ঘেষে ব্রেক কষলো। দরজা খুলে সর্বাঙ্গে ঢেউ তুলে নীচে নামলো মেয়েটি, হালকা সবুজ রঙের টাইটফিট সালোয়ার কামিজ পরেছে সে, ওড়না খানি পেচিয়ে গলায় কোন রকমে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তার প্রতিটি অঙ্গে একাধারে অতুলনীয় সৌন্দর্য এবং যৌবনের ঝিলিক। নিতম্বে অঢেল ছন্দের সৃষ্টি করে সিদ্দিক এন্টারপ্রাইজে ঢুকলো সে।
মোর্শেদের চোখ জ্বলছে। সেটাই স্বাভাবিক, গত এক মিনিটে একবারের জন্যেও চোখের পাতা ফেলা হয়নি। এমন দৃষ্টি মনোহর একটি দৃশ্য সেকেণ্ডের এক দশমাংশের জন্যেও মিস করতে রাজি নয় সে। তার প্রশ্বাসও অনিয়মিত হয়ে পড়ছে। হৃৎপিণ্ড কানের পাশে হাতুড়ি পিটাচ্ছে। বুকের ভেতরে কোথাও চিনচিনে একটি ব্যথাবোধ জেগে উঠেছে। মোর্শেদ বুঝলো, সে প্রেমে পড়েছে।
সেলিম ছেলেটি যথেষ্ট চালাক–চতুর। সুন্দরী নারীর আবির্ভাব এবং তৎক্ষণাৎ প্রভুর উদাসীনতার ভেতরে নিপুণভাবে দুয়ে দুয়ে চারের সম্মিলন ঘটিয়ে ফেললো সে।
–কোন আশা নেই ভাইজান। এইডা সিদ্দিক সাবের মাইয়া।

–তো কি?
–আপনে কি আমার লগে মশকরা করতাছেন ভাইজান? সিদ্দিক সাবের লগে আপনাগো যে খুন–জখমের সম্পর্ক।
–তোর সম্পর্কের খ্যাতা মুড়ি।
খ্যাতা মুড়ির ব্যাপারটি ঠিক পরিষ্কার হলো না সেলিমের কাছে। সে চিক্তি ত ভঙ্গিতে নাক চুলকালো। –তা যাই করেন, কিন্তু সিদ্দিক সাবে কিছুতেই আপনার লগে মাইয়া বিয়া দিবো না।
–আরে রাখ তোর বিয়ে। গাছে কাঠাল গোঁফে তেল অবস্থা। যা ভাগ।
সেলিমের মধ্যে ভাগার কোন লক্ষণ দেখা গেলো না, সে নিশ্চিক্ত ভঙ্গিতে হাসতে লাগলো।
মোর্শেদ রাক্তায় এসে দাঁড়ালো। মেয়েটিকে এখন পরিপূর্ণভাবে দেখা যাচ্ছে। বাবার সাথে কথা বলছে সে। কথা বলার সময় মাথাটি এপাশ–ওপাশ দুলে উঠছে, শ্যাম্পু করা উজ্জ্বল বব–ছাঁট চুলের রাশিতে ছন্দময় আলোড়ন ঘটছে, তাকিয়ে থাকার মতো একটি দৃশ্য। মেয়েটি বেশ চঞ্চল, সে ঘন ঘন পা বদল করছে। অপ্রয়োজনে হাত নাড়ছে, ওড়নাটিকে ফাঁসের মতো গলায় প্যাঁচাচ্ছে, কখনো সকনো ঝটিতে এদিক ওদিক চাইছে। মোর্শেদ কায়মনে প্রার্থনা করতে লাগলো, মেয়েটি অক্ত ত একবার পিছু ফিরে তাকিয়ে তাকে দেখুক, সে জানে মানুষ হিসেবে সে যথেষ্ট সুদর্শন। রঙটি অবশ্য প্রায় অমাবস্যা, কিন্তু সেটি তেমন দেখিয়ে থাকে।
মেয়েটি একবারও ফিরে তাকালো না। বাবার সঙ্গে কথা বলা হয়ে গেলে নর্তকীর ভঙ্গিতে ডান পায়ের পাতার উপর ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রায় দৌড়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলো। তার ভ্রমর দু'চোখের স্বপ্নালু দৃষ্টিতে এই মহাবিশ্বের কোন কিছুই বিশেষ ছায়াপাত করে বলে মনে হলো না। সুস্পষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেললো মোর্শেদ। তার বুকের চিনচিনে ব্যথাটি সমক্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়লো।
বৈকালিক আড্ডার আসরে যতি চিহ্নের মতো বসে আছে মোর্শেদ। বিচ্ছুগুলি বেশ দুশ্চিক্তায় পড়লো। রাসেল চুলের ঝোপে বার দুয়েক দ্রু ত হাত বুলিয়ে জানতে চাইলো–ব্যাপার কি মোর্শেদ ভাই? বাংলার পাঁচ বনে গেলেন কেন? সমস্যাটা কোথায়?
–আর বলো না ব্রাদার চারদিকে তিমিরের ঘনঘটা।
রণক চশমাটিকে নাকের ডগা থেকে ঠেলে তুললো–তিমির দেখছেন কোথায়? আমি তো দিব্যি আলো দেখতে পাচ্ছি।
–এ তো চোখের দেখা নয়রে ভাই, এ হলো মনের দেখা।
শাহেদ প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে বললো, ফেঁসে গেছেন বুঝি? কার সাথে? কবে? কখন? আমাদেরকে তো কিছুই বলেননি।
–বলবার মতো কিছু হলে তো বলবো। মেয়েটার নাক উঁচু। কতক্ষণ হাড়- হাভাতের মতো চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলাম, বেটি ফিরেও তাকালো না।
–জাকের বললো, কোথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন? কতক্ষণ? একবার তাকালো পর্যক্ত না?
–তাহলে আর বলছি কি? এমন ভাব দেখালো যেন দুনিয়ায় সে ছাড়া আর কেউ নেই, কিছু নেই।
সাব্বির উদাসীন গলায় বললো–আর তাতেই আপনি এমন মজাই মজেছেন যে মুখখানাকে একেবারে আমশি বানিয়ে ফেলেছেন।
–বলো কি, আমার মুখখানা আমশি হয়ে গেছে নাকি? ভারী বিপদ হলো তো। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তেমন সিরিয়াস কিছু না। এমনি ঠাট্টা করছিলাম।
রণক সবজাক্তার মতো মাথা দোলালো–উহু মোটেই ঠাট্টা নয়। চার চারটে চোখ মশাই, আর যাকেই ফাঁকি দিন আমাকে দিতে পারবেন না। মুখের ভাব দেখে ঠিকই মনের ভাব বলে দেবো। মেয়েটার প্রেমে আপনি হাবুডুবু খাচ্ছেন।
মজনু বললো–মিথ্যে বলবেন না, মোর্শেদ ভাই। আপনাকে হয়তো আমরা সাহায্যও করতে পারি।
রাসেল গম্ভীর হলো–দরকার হলে বাড়ি থেকে তুলে এনে হাজির করবো।
–হ্যাঁ, আমার চৌদ্দ গুষ্টিকে জেলের ঘানি টানানোর জন্য। ওসব কুমতলব ছাঁড়ো বাছাধন। পারলে মেয়েটার নাম, ঠিকানা জোগাড় করো।
–কোন মেয়েটির তাতো বলবেন ছাই।
–সিদ্দিক সাহেবের মেয়ে। ভদ্রলোকের সাথে আমাদের অবশ্য ঐ যাকে বলে দা কুমড়ো মার্কা সম্পর্ক। কিন্তু তা হোক, মেয়েটা মাইরি, মহা কিউট, চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না।
রঞ্জন বললো–আজ দুপুরে যিনি এসেছিলেন? সত্যি, দারু ণ দেখতে। এমন সুন্দরী মেয়ে খুব কমই হয়।
–শুধু সুন্দরী নারে ভাই, বড্ডো চঞ্চল যে। একটা মুহূর্ত চুপচাপ থাকতে পারে না। শুধু ছটফট করছে।
সাব্বির বললো–কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে আপনার সাথে যেন কত জন্ম জন্মাক্তরে পরিচয়।

মোর্শেদ অপ্রতিভ হয়ে পড়লো। শাহেদ যথেষ্ট কৌতূহল অনুভব করছে। সে প্রায় ফিসফিসিয়ে জানতে চাইলো–মেয়েটা আসবে না?

–আসা তো উচিত। বাবার দোকানে মেয়ে আসবে না কেন?

–না, মানে, এক নজর দেখতাম আর কি।

–দেখবে তাতে আর দোষ কি। কিন্তু নজর দিও না যেন ভাই। তোমাদের চেয়ে অনেক সিনিয়র।

–আরে না না, কি যে বলেন!

হাতে আদৌ কোন তথ্য না থাকায় কোন রকম পরিকল্পনা করা সম্ভব হলো না। তবে মোর্শেদকে বুঝিয়ে দেয়া হলো, এই প্রেম তার একরকম হয়েই গেছে। এতে বাগড়া বাঁধায় এমন বাপের ব্যাটা আজও জন্মগ্রহণ করেনি। চিন্তার কিছুই নেই। রাতে মোর্শেদের বিন্দু মাত্র ঘুম হলো না। সে ঐ মেয়েটাকে লাল বেনারসী পরিয়ে নানান রকম উদ্ভট চিন্তা–ভাবনা করতে লাগলো।

ঠিক তিন দিন বাদে ভর দুপুর বেলায় আবার এলো মেয়েটি। মোর্শেদের আকুল অপেক্ষার অবসান ঘটলো। সে গুটি গুটি পায়ে রাস্তা পেরিয়ে সিদ্দিক এন্টারপ্রাইজের সামনে এসে দাঁড়ালো। মেয়েটিকে আজ আরো সুন্দর দেখাচ্ছে, তার ছন্দময় শরীরের বাঁকে বাঁকে রক্তিম আঁটো সাঁটো পোশাকটি অদ্ভুত একাগ্রতায় বিলীন হয়ে গেছে। একবার চোখাচোখি হলো, টানা টানা দুটি আখিঁতে বিদ্যুৎ–ঝলকের মতো তীব্র রহস্যময়তা উঁকি দিয়ে গেল। মোর্শেদের কুপোকাত হবার দশা হলো। তার হাতের তালু বিশ্রীভাবে ঘামতে লাগলো। মেয়েটি অনেকক্ষণ বাবার সাথে কথা বললো এবং মোটমাট তিনবার পিছু ফিরে চটুল কটাক্ষ হানলো। অবশেষে বিদায়ের প্রাক্কালে মোর্শেদকে তীক্ষ্ণ পার্শ্ব চাহনীর প্রবল ধাক্কায় কাঁপিয়ে দিয়ে গাড়িতে উঠলো।

প্রচণ্ড শব্দে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হলো রাসেল এবং রণক। মোর্শেদকে দার্শনিকের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাদের চোখ কপালে উঠলো।

–কি ব্যাপার মোর্শেদ ভাই, এমন হাসমত বনে গেলেন কেন?

–কে রাসেল? কি ব্যাপার?

–আমার ফুপাতো বোনের বিয়ে। তাই আপনাকে দাওয়াত দিতে এলাম।

দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো মোর্শেদ। –আর বিয়ে!

–মানে?

–ঠাঁট দেখিয়ে চলে গেলোরে ভাই।

–কে?

–ঐ তো, সেদিন যার কথা বলেছিলাম।

–রণক লাফিয়ে উঠলো। সেই মেয়েটা? কোথায় গেল? কোন দিকে?

–ঐ তো সাদা গাড়িটাতে। দেখেছো? নীল টয়োটার পেছনেরটা।

রাসেল বিরক্ত হলো। মেয়েটা চলে গেলো আর আপনি এখানে গোবর্ধনের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। পিছু নিতে পারলেন না?

–বলো কি, পিছু নেবো?

–আলবত নেবেন, দরকার হলে পিছু নিয়ে জাহান্নাম পর্যন্ত যাবেন। নিন, মটর সাইকেলটা নিয়ে ছুটুন। মেয়েটির বাড়ি চিনে আসুন। নাকি আমিও যাবো?

–থাক, আমি একাই যাই। লাফিয়ে আদ্যিকালের দ্বিচক্রযানে সওয়ার হলো মোর্শেদ। বাতাসে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে জনমনে বিশেষ বিরক্তির উদ্রেক করে সাদা গাড়িটির পিছু নিলো সেটি।

পাঁচ মিনিটের মাথায় ধরা পড়ে গেলো মোর্শেদ। ড্রাইভার লোকটি অকল্পনীয় চতুর। পেছনের মটর সাইকেলটিকে তার সুবিধাজনক মনে না হওয়ায় সহজ সরল রাস্তা ফেলে প্যাঁচানো রাস্তায় নাক গলাতে শুরু করলো সে। মোর্শেদ মনে মনে দুহালি অকথ্য গালাগালি কষলো ব্যাটা ধড়িবাজ হৃদয়ের মর্ম বোঝে না। অকারণে জটিলতা বাড়িয়ে তুলছে।

দশ মিনিটের মাথায় গাড়িটাকে হারিয়ে ফেললো সে। সেই মুহূর্তে বেঁচে থাকা তার কাছে নিদারুন যন্ত্রণাময় মনে হলো। অর্থহীন, সবই অর্থহীন।

মোর্শেদকে ফিরে আসতে দেখে ছুটে এলো রাসেল ও রণক। –'বাসার খোঁজ পেলেন?'

–নারে ভাই। ড্রাইভারটা জাত হারামী। দিব্যি ঘোল খাইয়ে সটকে পড়লো।

–বলেন কি? ব্যাটাচ্ছেলের মাথা ভেঙ্গে কালিয়া বানাবো। এসব হচ্ছে প্রেম পুণ্যের ব্যাপার, তুই ব্যাটা গাড়োল এইসবের কি বুঝিস, এ্যাঁ?

উদাসভাবে চুলে হাত বোলানো মোর্শেদ। –আমার হবে না রাসেল। আমি শেষ।
–আরে অমন দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছেন কেন। রঞ্জনের মুখে শুনলাম বছরখানেক আগেও এদিকের চোক্ত বাত পাণ্ডাগুলোকে ঠেঙিয়ে টিট করেছেন। আর আজ এই এক রত্তি মেয়েটাকে কাবু করতে পারবেন না? এটা কোন কথা হলো!
রণক ফিক ফিক করে হাসতে লাগলো। –উনি করবেন কি, মেয়েটিইতো ওনাকে এক হাত দেখে নিচ্ছে।
–তা যা বলেছো ভাই, নাকে দড়ি দিয়ে চরকীর মতো ঘোরাচ্ছে। আমিও ব্যাটা বোকার হর্দ্দ, নেচেকুদে মরছি।
রাসেল আশ্বাস দিলো –ডু ফূর্তি, চিন্তার নো কারণ। আমাদের সবার এখন লম্বা ছুটি। কলেজে ভর্তি হতে সেই মাস খানেকের ব্যাপার। সুতরাং কাল থেকে আমরা আপনার দোকানে আখড়া বাঁধছি। শুধু মেয়ে কেন, মেয়ের মা, নানি, দাদির চৌদ্দ পুরুষের ঠিকানা পর্যন্ত জোগাড় করে ফেলবো।
–না বাবা, ঐ সব বুড়ো বুড়ীদের ধরে টানা হ্যাচড়া করার কোন প্রয়োজন নেই। আমার ঐ একটি ঠিকানা হলেই চলবে।
–ঠিক আছে, দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কেসটা যখন আমরা নিয়েছি তখন হিলে-একটা হবেই।
–দেখো, সেবার স্টেডিয়ামে আরেকটু হলে কপালটা দুফাক করে দিয়েছিলে, এবার যেন হার্টটাকে ফালি ফালি করে দিও না।
আরে না না, মোর্শেদ ভাই, বারে বারে ঘুঘু ধান খায় না।

দুদিন বাদে মেয়েটি আবার এলো। সম্ভবত এই কালো মতন সুদর্শন ছেলেটির প্রতি সেও কিছুটা কৌতূহল বোধ করতে শুরু করেছে। আজ গাড়ি থেকে নেমেই দোকানে ঢুকলো না সে। ধীরে ধীরে এদিক ওদিক চোখ বোলালো। দুটি উদগ্রীব চোখে দৃষ্টি মিলতে সময় লাগলো না। মেয়েটি মুহূর্তের মধ্যে ভ্রূ তে বিরক্তির কাঁপন তুলে দোকানে ঢুকলো, যেন এই ছেলেটির কারণে তার জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠেছে।
মোর্শেদ দাঁড়িয়েছিলো রাস্তার বিপরীত পার্শ্বে। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে দুজন।
–এই মেয়েটাই নাকি মোর্শেদ ভাই? শাহেদের কণ্ঠে বিশেষ ধরনের উদগ্রীবতা।
–হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ, আর কতবার বলবো?
–কিন্তু এযে দেখি হুরপরী। যাকে বলে ডানা কাটা পরী। মাইরী ...
–নজর দিও না ভাই, নজর দিও না। হৃদয়ে বড় আঘাত পাই।
–না না, নজর দেবো কেন। এমন সুন্দরী একটা ভাবী পেলে তো আমরাও বর্তে যাই।
–আর ভাবী? দেখলে না কেমন মুখ বাঁকালো, যেন নেড়ী কুত্তা দেখছে। না না, মান–ইজ্জত বলে আর কিচ্ছু থাকলো না।
সাব্বির দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো। –কি আর করবেন বলুন, পুরুষ হয়ে যখন জন্মেছেন, মেয়েদের গোলামী তো করতেই হবে।
মোর্শেদ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো। –তা যা বলেছো ভাই। ঘুম হারাম হয়ে গেছে আমার। পোলাও কোর্মার স্বাদও বাঙ্গির মতো মনে হয়। জীবনটা বরবাদ হয়ে গেলো।
শাহেদ উত্তেজিত হয়ে বললো, –এই মোর্শেদ ভাই, আবার তাকালো যে?
–তাকালো আর কোথায়, ভ্যাঙচালো বোধ হয়। কপালে পাঁচ খানা ভাজ ফুটে উঠলো, খেয়াল করনি?
–ধ্যাৎ, কি যা তা বলেন? এতো সুন্দরী মেয়েদের কপালে ভাঁজ থাকে নাকি।
–কপালে থাকে নারে ভাই, মনের মধ্যে থাকে। দুনিয়ার কোন ছেলেকেই যোগ্য মনে হয় না। সবাই তুচ্ছ, সবাই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কীট।
–ধ্যাৎ, ধ্যাৎ, কি যে সব বলেন।
মেয়েটি শাহেদের চেয়ে নিদেন পক্ষে বছর চারেকের বড় কিন্তু তবুও সে হৃদয়ে চনমনে ধরনের একটি সুক্ষ্ম ব্যথা অনুভব করতে শুরু করলো। হায়রে সমাজ, বয়স বয়স করে মরলি। প্রেমের আবার বয়স কিরে? সে খুব টিপে টিপে একটি বিষাদক্ষিন্ন নিঃশ্বাস ছাড়লো।
মেয়েটি শেষবারের মতো ভ্রূ কুটিল দৃষ্টিতে মোর্শেদকে আঘাত হেনে শুভ্রধবল ডাটসানের পেটের মধ্যে হারিয়ে গেলো। ড্রাইভারটি মাঝবয়সী। সে ট্যারা চোখে লম্বা, কালো ছেলেটিকে ভালোমতন পরখ করে নিলো। এই ছেলেটিই সেদিন তাদেরকে অনুসরণ করছিলো। কথাটি সাহেবের কানে তোলা উচিৎ ছিলো। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি সে। ভালোভাবে না জেনে শুনে কিছু করা ঠিক হবে না। গোলমাল বেঁধে যেতে পারে। আজ ভিউমিররে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সামনে বাড়লো সে। মেয়ের কোন ক্ষতি হলে সাহেব তাকে আস্ত রাখবে না। নির্ঘাত যাবজ্জীবন হাজতবাস করিয়ে ছাড়বে।

গুলিস্থানে পৌঁছে পেছনের ট্যাক্সিটিকে প্রথম লক্ষ্য করলো ড্রাইভার রজব আলী। নিশ্চিত হবার জন্য গাড়ির গতি কমিয়ে দিলো সে, তৎক্ষনাৎ ট্যাক্সিটির গতিও কমে গেলো। তার বুঝতে বাকী থাকলো না, সেই ছেলেটি তাদেরকে অনুসরণ করছে। রজব আলী ঘামতে শুরু করলো। এ কি বিপদে পড়লো সে? ছেলেবেলায় লুকোচুরি খেলাটি তার খুব প্রিয় ছিলো, কিন্তু এই বয়সটি ঐ ধরনের ছেলে মানুষটার ঠিক উপযুক্ত নয়। গতবার ছেলেটিকে খসাতে বেগ পেতে হয়েছিলো, এবার কি হবে কে জানে? সে গীয়ার বদলে এক্সেলেটরে পায়ের চাপ বাড়ালো, গতির প্রতিযোগিতায় ট্যাক্সিটিকে আপাতত পরাজিত করতে পারলেই খুশী। সাহবের কানে কালই সমস্ত ব্যাপারটা তুলতে হবে। রোজ রোজ এই বিপদ ঘাড়ে বয়ে বেড়ানোর কোনই অর্থ হয় না।
সিদ্ধেশ্বরী এসে সাদা ডাটসানটি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। মোর্শেদ উদভ্রান্তের মতো মাথায় হাত দিলো।
–ও রাসেল, শালারা গেল কোনদিকে?
–তাইতো, কোন দিকে গেল? সোজা চলে গেলো, না গলিতে ঢুকলো?
–আর সোজা বাকা। কপালে নেই বুঝলে। কপালে থাকলে আর এই গোলক ধাঁধাঁর খপ্পরে পড়তে হতো না। ব্যাটা ইঞ্জিনিয়ারের পিন্ডি চটকাই। গণ্ডা গণ্ডা রাস্তা এনে জংশন বানিয়ে ছেড়েছে, একেবারে মহাতীর্থ।
রণক ভরসা দিলো, –অতো মুচড়ে পড়ছেন কেন মোর্শেদ ভাই? বেটিকে ঠিকই খুঁজে বের করবো।
–ছিঃ ছিঃ বেটি বলো না, হৃদয়ে বড় আঘাত পাই।
শাহেদ উজ্জ্বল মুখে বললো, –ইস, আপনি বড্ডো লাকী মোর্শেদ ভাই। এমন সুন্দরী মেয়ে হাজারে একটা মেলে না। এক্কেবারে ফরমায়েশ দিয়ে বানানো যেন। কি চোখ, কি মুখ, কি ফিগার ...
–সে কি! তুমি আবার ওর শরীরটরির নিয়ে টানাটানি শুরু করছো কেন?
ট্যাক্সি ড্রাইভার বয়সে তরুণ। সমস্ত ব্যাপারটিই তার কাছে নিদারুণ উপভোগ্য মনে হচ্ছে। সে উত্তেজিত স্বরে বললো, –নিশ্চয় আশে পাশেই কোথাও থাকে। ডানের গলিটাতে একবার ঢুমেরে দেখবো নাকি? কি বলেন ব্রাদার?
–ডানে তো ভাই সারা পৃথিবী পড়ে আছে। ঢুমারতে মারতে একেবারে পৃথিবী প্রদক্ষিণ হয়ে যাবে যে? বরাতটাই খারাপ বুঝলেন কিনা, সারাটা জীবন শুধু দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খেলাম। মোর্শেদ ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়তে লাগলো।
রাসেল গম্ভীর গলায় বললো, –দরকার হলে পুরো পৃথিবীই চক্কর দেবো। নিন, ডানেই চলুন। দেখি কার দৌড় কতদূর?
–তা যা বলেছেন। যাবে আর কোথায়! এইতো এইটুকুন পৃথিবী? ড্রাইভার ছেলেটি সোৎসাহে ডানে বাঁক নিলো।
মিনিটি বিশেক ধরে সমস্ত এলাকা চষে বেড়িয়েও ডাটসান অথবা মেয়েটির কোন সন্ধান পাওয়া গেলো না। উপরন্তু একটি বেহুদা হুজুত পাকিয়ে গেলো। এলাকার মাস্তান গোষ্ঠির তরুণেরা গাড়ি আটকিয়ে দিলো।
–কি ব্যাপার, এদিকে এতো ঘুর ঘুর করছেন কেন? গরু ছাগল হারিয়েছেন নাকি?
–মোর্শেদ খুব মিষ্টি একটুকরো হাসি দিলো। না ভাই। এই ঢাকা শহরে নিজে লেজ বিশিষ্ট জীব না হলে কি কেউ ঐ ঝামেলায় যায়। আমরা আসলে একটা ছেলেকে খুঁজছি।
–বাসার নাম্বার কত?
–নাম্বারই যদি জানতাম ভাই তাহলেতো ঠেলে বাড়িতেই গিয়ে উঠতাম।
–নামটা নিশ্চয় জানেন?
–নাম? নিশ্চয়, নিশ্চয়। বেশ মিষ্টি নাম ...
–মজনু তরী সামলালো। –মুকিত, চেনেন নাকি? ইউল্যাবে পড়ে। বেটে খাঁটো, ফর্সা।
তারা চিনতে পারলো না। তবে নিরীহ ভঙ্গিতে শাসিয়ে দিলো। –দেখুন ঢাকা শহরটা পাড়া গা নয়। কোটিপতি কি ফকিরনীর ঝি, কাউকেই কেউ চেনে না। সুতরাং ঠিকানা–ফিকানা নিয়েই আসবেন, নইলে ... বাকীটুকু তারা কিছু অভিজাত অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলো।
মোর্শেদের মেজাজ খিচড়ে গেছে। প্রেমের মুখে ঝাড়ু। কোন কুক্ষণে যে ঐ মেয়ের মুখ দেখেছিলো? এই সব উড়নচণ্ডীর দল পর্যন্ত বাগে পেয়ে আঙুলের গাঁট দেখিয়ে দেয়! নসীব, সবই নসীব।
ড্রাইভার ছেলেটির উৎসাহে বিন্দুমাত্র কমতি পড়েনি। সে উদ্দীপ্তস্বরে বললো, চলুন, এবার তাহলে মালিবাগের দিক থেকে একটা চক্কর দিয়ে আসা যাক।
মোর্শেদ তাকে কড়া গলায় একটা ধমক দিলো। –যে চুলো থেকে এসেছিলাম, সেই চুলোয় চলুন।
ছেলেটি ব্যাজার মুখে হুইল ঘোরালো।
শাহেদ আর্তস্বরে বললো, –সে কি মোর্শেদ ভাই, মেয়েটিকে খুঁজবেন না? আমার মন বলছে এবার ঠিকই পাওয়া যাবে।

–দরকার নেই আমার কোন মেয়েছেলের। এখন গিয়ে দোকানে বসবো। একমনে ব্যবসা করবো। কাপড় বেচে দুনিয়া আমি উদ্ধার করবো।
সাব্বির যোগ করলো, –সেই ভালো। বেচারী পৃথিবীর এখন বড্ডো দুঃসময়।
পৃথিবী? কিসের পৃথিবী? সব ধুঁয়ো, সব কুয়াশা। মোর্শেদ আপন মনে জগৎ সংসারের তাবৎ বস্তুর উপর আক্রোশ ঝাড়তে লাগলো।

মুকিত ছেলেটি বাস্তবিকই মজনুর বন্ধু। সে সিদ্ধেশ্বরীতেই কোথাও থাকে। মজনু পরদিনই তার ঠিকানা জোগাড় করে ফেললো। এক অপরাহ্নে মোর্শেদের টয়োটা ডিলাক্সে চেপে সেখানে হাজিরাও দেয়া হলো। মুকিত মজনুকে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠলো।
–কতদিন পর দেখা হলো! ছিলি কেমন?
–আর থাকা! বড় বিপদে পড়েছিরে।
–তোর আবার কিসের বিপদ?
–একটা মেয়েকে খুঁজছি। হেভী সুন্দরী। এ দিকেই কোথাও থাকে বোধ হয়।
–বলিস কি রে! ফেঁসে গেলি শেষ পর্যন্ত?
–আরে না না, আমি না। ইনি।
মোর্শেদ বত্রিশ পাটি দাঁত দেখালো।
মুকিত সবাইকে নিয়ে বসন্ত পাড়া ঝেটিয়ে বেড়ালো। সুন্দরী ললনাদের অভাব নেই, কিন্তু যাকে খোঁজা হচ্ছে তাকে দেখা গেলো না। মোর্শেদ খুব মুচড়ে পড়লো।
–বোধহয় আমাদেরই ভুল হচ্ছে। মেয়েটি হয়তো এদিকে থাকেই না।
বিধাতা মুচকি হেসে মুখ ঢাকলেন। মুকিতদের পাশের বাড়িটিই সিদ্দিক সাহেবের। একটি রিক্সা টুং–টাং সুরধ্বনি ছড়িয়ে সামনে ব্রেক কষলো। প্রথমে হলুদ সালোয়ার ঘেরা একটি ফর্সা পা, পরবর্তীতে একই রঙের ঢোলাঢালা কামিজ এবং শ্যাম্পু করা কৃষ্ণ বব ছাঁট চুলের রাশি চোখে পড়লো। মোর্শেদ বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো। হা খোদা, কি রঙ্গই তুমি জানো।
ছটি কণ্ঠ একযোগে গুড়িয়ে উঠলো, –আরে এই তো।
মুকিত অবাক স্বরে বললো, –এতো উষা আপা।
মোর্শেদ আবেগে কম্পিত হয়ে তার হাত চেপে ধরলো। –বলো কি, তুমি চেনো ওকে?
–চিনি মানে, খুব ভালো করে চিনি। ওনার সাথে আমার খুব খাতির। ডাকবো নাকি।
–না না। থাক। কি না কি মনে করে বসবে আবার।
–না না, কি মনে করবে আবার? ডাকি কি বলেন।
ডাকতে হলো না। মেয়েটি নিজেই ঘুরে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে হেঁটে মোর্শেদের সামনে এসে দাঁড়ালো। তার রক্তিম দুটি ঠোটে রোমাঞ্চকর এক চিলতে হাসি।
–আচ্ছা, আপনি আমার পেছনে লেগেছেন কেন বলুনতো?
–জ্বি, আমি? না না, পেছনে লাগবো কেন? সে কি কথা।
–ঢং করবেন না। সেদিন আপনারা আমাকে ফলো করে এই পর্যন্ত এসেছিলেন। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেছিলেন।
–আপনি আমাদেরকে দেখেছিলেন তা হলে। অথচ–
–অথচ আপনাদেরকে ডেকে সসম্মানে বাসায় নিয়ে গিয়ে কেন চা–বিস্কুট–চমচম খাওয়াইনি, তাইতো?
–না না, আমি কি তাই বলছি নাকি?
–দেখুন, আপনার যা খুশি বলুন, যা খুশি কর ন, কিন্তু আমার পিছনে ঘুর ঘুর করবেন না। যে সব ছেলেরা মেয়েদের সাথে আদেখলোপনা করে তাদের আমি একদম সহ্য করতে পারি না।
–তা তো বটেই, পেছন কেউ ঘুর ঘুর করলে খারাপ তো লাগবেই।
–কথাটা যেন মনে থাকে। উষা ফিরতি পথ ধরলো।
বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মোর্শেদ। এ যে ছন্দের ছড়াছড়ি। কুন্তলে, বাহুতে ইয়েতে, আহা।

রাসেল এইসব সৌন্দর্যের তোয়াক্কা করে না। তার মন খারাপ হয়ে গেছে। সমস্ত ব্যাপারটাই কেঁচে গেলো। সে মোর্শেদের পিঠে সজোরে খোঁচা দিলো। –এসব কি হলো?
–কেন, কি হলো আবার।
–হাতের মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দিলেন?
–তবে কি জাপটে ধরে আবৃত্তি করবো, আমি তোমায় ভালোবাসি গো, তোমায় ছাড়া বাঁচবো না।
-অতদূর না এগুলেও চলতো। কিন্তু অমন আম্‌সি মেরে গেলেন কেন?
মোর্শেদ খুক খুক করে কাশলো। –বুঝলে কিনা, অভ্যাস নেই। তবে ভেবো না, পরের বার ঠিকই ম্যানেজ করে ফেলবো।
–ঘোড়ার ডিম করবেন।
উষা গেট পেরুনোর আগে বেশ কায়দা করে ঘাড় বেঁকিয়ে আলতো ভঙ্গিতে একটি কটাক্ষ হানলো, কালো ছেলেটি হাঁ করে তাকিয়ে ছিলো, ঝট করে চোখ ফিরিয়ে নিলো, হেসে ফেললো উষা। পাগল কোথাকার।
–মুকিত!
–কি মোর্শেদ ভাই?
–একটা ব্যবস্থা করো ভাই। তোমার সাথে না খুব খাতির?
মুকিত কাঁচুমাচু হয়ে ঘাড়ে হাত বোলালো। –ইয়ে মোর্শেদ ভাই, ব্যাপারটা একটু জটিল। উষা আপার বাবা–মা খুব ঘোড়েল আদমী, আমাকে পর্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখে, যদি একবার শোনে যে আমি তাদের মেয়ের প্রেমের ঘটকালী করছি–বুঝলেন কিনা–
মোর্শেদ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।
সাব্বির উদাসীন গলায় বললো, একেই বলে ভবিতব্য। হাতের নাগালে রহিয়াও কতই না দূরে।
রণক চশমা মুছতে মুছতে খোঁটা দিলো, তা যা হোক মেয়েটা এক হাত নিলো বটে।
জাকের ইন্ধন জোগালো, পারে তো চড়ই মেরে বসে আরকি।
মোর্শেদ গালে হাত বোলালো! সেও ভালো ছিলো, অন্তত একটা ছোঁয়া পাওয়া যেতো।
শাহেদ উৎসাহিত হয়ে বললো, ঠিক বলেছেন, ঐ হাতের চড় খেলেও জীবন সার্থক।
মুকিত গাম্ভীর্য নিয়ে প্রস্তাব দিলো, ঠিক আছে, আমি গিয়ে তাহলে উষা আপাকে ডেকেই নিয়ে আসি, চড় থাপ্পড় খাবার এতো উৎসাহী পাবলিক পেলে উনি কিছুতেই না করবেন না।
মোর্শেদ দ্রুত গাড়িতে চলে বসলো। এই ছেলেগুলিকে কোন বিশ্বাস নেই। এদের বদৌলতে মাথাটা একবার ঘেটুকচুর মতো ফুলে উঠেছিলো। এখন আবার জলজ্যান্ত দিনের আলোয় চড় থাপ্পড় খাওয়াবার ব্যবস্থা করছে। কখন কি হয়ে যায় কিছুই বলা যায় না। রাসেলরাও তাকে অনুসরণ করে গাড়িতে উঠলো। তারা বিদায় নেবার আগে সিদ্দিক সাহেবের বাসার সামনে দীর্ঘক্ষণ ভেঁপু বাজিয়ে গেলো। মোর্শেদ আশা করেছিলো মেয়েটি হয়তো একবার মুখ বাড়িয়ে দেখবে। কিন্তু মেয়েটি অতিরিক্ত চতুরা, সে তার ছায়াও দেখালো না।

দুই

দোকানে মোর্শেদের মন বসছিলো না। হৃদয় বড়ই চঞ্চল হয়ে আছে। বার বার সিদ্ধেশ্বরী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। খুবই বিশ্রী ব্যাপার, এই পরিণত বয়সে এতখানি চপলতা শোভা পায় না। কিন্তু তবুও উপায় নেই, হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন কাজ। মোর্শেদ একান্ত নিরুপায় হয়েই রওনা দিলো। সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুল থেকে উষাদের বাড়িটি দেখা যায়। সে ভর দুপুরবেলা প্রখর রৌদ্র উপেক্ষা করে ফুটপাথে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকলো। মেয়েটি একবারও বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াবে না এমনটি হতেই পারে না। সম্পূর্ণ ব্যাপারটিতেই প্রচণ্ডরকম ছেলেমানুষী রয়েছে, তবুও দাঁড়িয়ে থাকতে মোটেই খারাপ লাগছে না তার। প্রিয়জনের জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গোনাও তৃপ্তিকর।

কিন্তু বিপদ যখন আসে তখন আঁট-ঘাট বেধেই আসে। সম্প্রতি রাজধানীতে মস্তান নিধন প্রকল্প চালু হয়েছে। প্রেমাকাংখী হতভাগ্য তরুণদেরকে মেয়েদের স্কুল কলেজের সামনে থেকে নিষ্ঠুর ভাবে পাকড়াও করে ভ্যানে তোলা হচ্ছে এবং হা ঘরে চালান দেয়া হচ্ছে। বিশালদেহী কৃষ্ণবর্ণ সার্জেন্টটি অনেকক্ষণ ধরেই যুবকটিকে লক্ষ্য করছিলেন। হাবে-ভাবে যথেষ্ট ভদ্র কিন্তু উদ্দেশ্যটি খুব সুবিধার মনে হচ্ছে না। তিনি লম্বা লম্বা পায়ে হেঁটে এসে মোর্শেদকে কব্জা করলেন।
-এই যে, এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কাজ-কর্ম কিছু নেই নাকি?
এই আকস্মিক আক্রমনে মোর্শেদ খুব বিমুঢ় হয়ে পড়লো। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকাটাও যে আইন বহির্ভূত এমন কথা সে কখনো শোনেনি। অথচ সার্জেন্টির মুখভাবে দেখে মনে হচ্ছে তিনি জোড়া খুনের আসামীর সাথে বাতচিৎ করছেন।
-কি ব্যাপার, কথা বলছেন না কেন?
-জ্বি, কি বলবো? মোর্শেদ ন্যাকা সেজে যায়।
-এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?
-কোন কারণ নেই, এমনিই।
-ফালতু কথা বলবেন না। ভেবেছেন আমরা কিছু বুঝি না? বয়স তো অনেক হয়েছে, এখনও এই সব কচি-কাঁচা মেয়েদের পেছনে লেগে আছেন কেন? যান, বাড়ি গিয়ে বাপকে বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলুন।
বিপদের আকার আকৃতিটি এতক্ষণে মোর্শেদের বোধগম্য হয়। গার্লস স্কুল এবং মাস্তান ধর-পাকড়ের মধ্যে যে চমৎকার যোগ সূত্রটি রয়েছে সেটিও এবার চোখে পড়ে। সর্বনাশ আর কাকে বলে। সে বিশাল এক টুকরো হাসি দেয়।
-আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমার তেমন কোন সদিচ্ছা নেই।
-তাহলে এই রোদের মধ্যে গ্যাট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? নাকি শরীরে ভিটামিন ই লাগাচ্ছেন?
-জি না, ওসব কিছুই না। আমি ঐ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।
-বলেন কি। আপনার কাণ্ডকারখানা তো খুব রহস্যময় মনে হচ্ছে। কি আছে বাড়িটাতে?
-একটি মেয়ে। বুঝলেন কিনা, কপালের ফেরে মেয়েটাকে ভালোবেসে ফেলেছি, কিন্তু ও পক্ষ থেকে মোটেই সাড়া পাচ্ছিনা, কদিন আগে রীতিমতো যেচে এসে ধমক লাগিয়ে গেলো। তারপরও কাণ্ডজ্ঞান হলো না। এই দেখুন, শুধুমাত্র একপলক দেখবো বলে সেই কখন থেকে এই গরমের মধ্যে হ্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে আছি।
-হাঃ হাঃ হাঃ আপনার দেখি আমার দশা। তখন আর কতইবা বয়স হবে, চব্বিশ-পঁচিশ, আপনার মতই আরকি, একটা মেয়েকে বড় ভালো লেগে গেলো। সেই মেয়েকে একটু দেখার জন্য সকাল বিকাল তিন মাইল রাস্তা ঠেঙিয়ে ওদের কলেজের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। হাঃ হাঃ, অবস্থাটা বিবেচনা করুন দেখি একবার। তা শেষ পর্যন্ত কি হলো জানেন? খবর নিয়ে জানলাম, বিবাহিতা, দুই ছেলের মা, বড়টার নাম রাসু, ছোটটার নসু। কি সাংঘাতিক ব্যাপার! পাক্কা তিন দিন তিন রাত্রি ঘরের ছিটকিনি লাগিয়ে চুপচাপ বসেছিলাম, হাঃ হাঃ হাঃ।
-যৌবনের প্রেমতো, এক্কেবারে সৃষ্টি ছাড়া, আপনার উনির ব্যাপারখানা কি? ফাঁকা-টাকা আছে তো? দেখবেন শেষে আবার আমার মতো হাঃ হাঃ হাঃ।
-না না আমি ভালো মতন খোঁজ খবর নিয়েছি। বিয়ে তো বিয়ে, এমনকি একটা প্রেম পর্যন্ত করেনি।
-যাহ এটা কি বিশ্বাস করা যায় না কি? আজকাল তো এ দেশের সব মেয়েই দশ বছর বয়স থেকে প্রেম করতে শুরু করে। ভালো মতো খোঁজ খবর নিয়েছেন তো?
-অবশ্যই। আমি অতো কাঁচা কাজ করি না।

বললেই হলো আর কি? প্রেমে পড়লে সব কাজই কাঁচা হয়ে যায়। নইলে কি আর এই রোদের মধ্যে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকেন। যান না, ওদের বাড়ির সামনে যে কৃষ্ণচূড়াটা আছে ওটার নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন।
–আপনার মাথা খারাপ হয়েছে? ওর বাবা আমাদের প্রাণের শত্র । দেখতে পেলে কুকুর লেলিয়ে দেবে না?
–এহ, কুকুর লেলিয়ে দিলেই হলো, না? ব্যাটার নামে মার্ডার কেস ঠুকে দেবো না। যান তো, ওখানে গিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন। বাকিটা আমি সামলাবো।
মোর্শেদ খুব বিপদে পড়লো। একেই বলে শাঁখের করাত অবস্থা। এখন সে যদি আপত্তি জানায় তাহলে সার্জেন্ট ধরে নেবে ব্যাটাচ্ছেলে এতক্ষণ গপ্‌পো মারছিলো, সম্মতি জানানোটাও বিশেষ সুবিধাজনক নয়। অবশ্য তাকে কষ্ট স্বীকার করে সিদ্ধান্ত নিতে হলো না, সার্জেন্টটি তাকে একরকম টেনে হেঁচড়ে সেই কৃষ্ণচূড়ার নিচে দাঁড় করিয়ে দিলেন।
থাকুন দেখি এখানে গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে। দেখি কোন বাপের ব্যাটা কি বলে?
তিনিও মোর্শেদের সাথে পাক্কা একটি ঘণ্টা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কোন বাপের ব্যাটাই একটি টুশব্দও করলো না। মেয়েটিকে এক মূহুর্তের জন্যেও না দেখে তিনি খুবই বিরক্ত হলেন।
–এই বাড়িটাইতো নাকি? আপনার আবার ভুল–টুল হচ্ছে নাতো?
–না না ভুল হবে কেন?
–ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। প্রেমে পড়লেন মানুষ সবকিছুতেই তালগোল পাকিয়ে ফেলে। এই বাড়িটাতে আদৌ কোন মেয়েটেয়ে থাকে বলেতো মনে হচ্ছে না। যান ভালো করে ঠিকানাটা জেনে নিন, কাল এমনি সময় আসবেন, দুজনে মিলে মেম সাহেবকে ঠিকই খুঁজে বের করবো।
পরবর্তী তিনদিন ভুলেও সিদ্ধেশ্বরীর দিকে পা বাড়ালো না মোর্শেদ।
কিন্তু এভাবে চলে না। কিছু একটা করা যে একান্ত ই প্রয়োজন। এতো উতলা অন্ত র নিয়ে জীবন যাপন করা চলে না। শাহেদ একটি বুদ্ধি বাতলালো।
–একটা ফোন করেই দেখুন না, মোর্শেদ ভাই।
–নাম্বার পাবো কোথায়?
শাহেদ লাজুক হাসি দিলো। –সে আমি আগেই মুকিতের কাছ থেকে জোগাড় করে ফেলেছি।
মোর্শেদ সন্দেহ ভরা দৃষ্টিতে শাহেদকে পর্যবেক্ষণ করলো। এই ছেলেটির ভাবগতিক সুবিধার মনে হচ্ছে না। সম্ভবত ইতিমধ্যেই উষাকে দুচারবার বিরক্ত করেছে সে। এদের জন্য কিছুই অসম্ভব নয়।
–না থাক, ক্ষেপে যেতে পারে।
–কি যে বলেন, মেয়েরাতো ছেলেদের ফোন পাবার জন্য পাগল হয়ে থাকে।
–হ্যাঁ, তোমাকে বলেছে।
শাহেদ আর উচ্চবাচ্য করলো না। উষা তাকে পর পর তিন দিন চড় মেরে দাঁত ভেঙে ফেলার হুমকি দিয়েছে। রনক হাসি হাসি মুখে বললো, কর নই না একবার। জীবনে সব ধরনের অভিজ্ঞতাই থাকা উচিৎ।
কথাটি মোর্শেদের মনে ধরলো। এইভাবে সে কখনো ভাবেনি। রাসেল বললো, দিন ঠুকে।
–দেবো?
–আলবত।
ছটি নাম্বার ডায়াল করতে দীর্ঘ সময় লাগলো মোর্শেদের। তার গলা শুকিয়ে গেছে। মেয়েটি অতিরিক্ত বুদ্ধিমতী। কথার মারপ্যাচে না আবার নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে।
–হ্যালো? মিষ্টি নারী কণ্ঠ ভেসে এলো।
মোর্শেদের হৃদকম্পন বেড়ে গেলো। মুখের ভেতরটা কাগজের মতো শুষ্ক মনে হচ্ছে।
–হ্যালো? কে? কথা বলছেন না কেন? নারী কণ্ঠে অনুযোগ।
রাসেল ধমকে উঠলো, কি হলো, মোর্শেদ ভাই? আপনার জিভটা পাংচার হয়ে গেছে নাকি? কথা বলুন।
হ্যালো! শব্দটি উচ্চারণ করতে মোর্শেদের গলা দুবার কেঁপে উঠলো।
–কে বলছেন?
–মোর্শেদ।
–মোর্শেদ? সেটা আবার কে? এই নামের কাউকে চিনি বলে তো মনে পড়ছে না।

–সেদিন আপনি যাকে ধমকালেন ... ।
সুরেলা হাসির শব্দ ভেসে এসো । –ধমক খেয়েও আপনার শিক্ষা হলো না । আর কি করলে আপনার চোখ খুলবে বলুন তো? মুকিত অবশ্য বলেছে, আমার হাতে থাপ্পড় খাবার জন্য আপনি পাগল হয়ে আছেন ।
মোর্শেদ হেসে ফেললো । –মুকিত খুব বেশি কথা বলে ।
–মুকিতের কথা বাদ দিন । আপনি কি চান তাই বলুন ।
–আমি আবার কি চাইবো? কিছুই চাই না ।
–তাহলে ফোন করেছেন কেন?
–আপনার সাথে একটু কথা বলতে ইচ্ছে হলো ... ।
–কেন, এতো মানুষ থাকতে আমার সাথেই কথা বলতে ইচ্ছে হলো কেন?
–কথা বলার মতো আমার তেমন কেউ নেই ।
–গার্ল ফ্রেণ্ড?
–না না ।
–বলেন কি? এতোদিন ধরে তাহলে কি ভেরেণ্ডা ভাজলেন?
–আরে বাহ্, আপনার নিজেরও তো কোন বয় ফ্রেন্ড নেই ।
–আপনি জানলেন কি করে?
মোর্শেদ বিষম খেলো । উষা হালকা গলায় হেসে উঠলো ।
–খুব খোঁজ খবর নিচ্ছেন বুঝি?
–না না, আপনি যা ভাবছেন তেমন কিছু নয় ।
–মি. মোর্শেদ ।
–বলুন ।
–ভবিষ্যতে আমাদের বাড়ির সামনে এসে কখনো দাঁড়িয়ে থাকবেন না ।
–মানে আপনি...
–জ্বি, আমি পুরো ঘটনাটাই দেখেছি । জানেন, হাসতে হাসতে সেদিন আমার পেটে খিল ধরে গিয়েছিলো । উজবুক কোথাকার ।
–জ্বি!
–জ্বি । আপনি একটা আস্ত উজবুক । রাখি কেমন?
লাইন কেটে যায় । দুজোড়া তীব্র কৌতুহলী চোখ মোর্শেদকে পেঁচিয়ে ধরে । –কি ব্যাপার, লাইন কেটে দিলো নাকি? কি বললো শেষে?
প্রাণে ধরে সত্যটি প্রকাশ করতে পারলো না মোর্শেদ । গম্ভীর গলায় বললো, ওর মা রাগারাগি করছিলো তাই রেখে দিলো । পরে আবার ফোন করতে বলেছে ।
শাহেদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো, সত্যি?

দিনটি ছুটির । মোর্শেদের পক্ষে বাসায় চুপচাপ বসে থাকা কিছুতেই সম্ভব হলো না । ছুটির দিনগুলিতে মনটা অকারণেই বড় চঞ্চল হয়ে ওঠে । অভাবনীয় কিছু করতে ইচ্ছে হয় । মোর্শেদ তাই সকাল দশটার দিকে মটর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো । আজ আর সে উষাদের বাড়ির চত্ত্বর মাড়ালো না । অদুরেই অবস্থিত 'চমক'্ল্যাক সপে আস্তানা গাড়লো । দোকানী ছেলেটি অল্প বয়সী । মোর্শেদকে অর্থহীনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে খুব অবাক হলো । কি ব্যাপার ভাইজান, কাউকে খুঁজছেন?
–না রে ভাই, একজনকে দেখবো বলে দাঁড়িয়ে আছি ।
–কাকে?
–ঐ বাসার মেয়েটাকে ।
দোকানী ছেলেটি খিল খিল করে হেসে উঠলো । –উষা আপাকে?
–চেনো নাকি তুমি?
–চিনবো না কেন? উনি তো রোজ আমার দোকানে এসে কোন আইসক্রীম খেয়ে যান ।

–তাই নাকি! আজ কি খাওয়ার পর্ব চুকে গেছে?
–নাহ এখনও আসেননি। তবে আসবেন বোধহয়। রেগুলার একটা করে আইসক্রীম না খেলে ওনার নাকি রাতে ঘুম হয় না।
মোর্শেদ বেশ উজ্জীবিত হয়ে উঠলো। কপাল ভালো থাকলে একবার দেখা হয়েও যেতে পারে।
উষা ছেলেটিকে অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছে। জানালার পর্দা সামান্য সরিয়ে দেখছে সে। সম্ভবত ছেলেটি তাকে দেখতে পায়নি। উষার বেশ আনন্দ বোধ হচ্ছে। সুন্দরী বলে তাকে অনেক সময়ই অনেক ঝুট ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এখনও বহু দীর্ঘ প্রেমপত্র আসে। কিন্তু এই ছেলেটির কাণ্ড কারখানা সব কিছুকেই ছাড়িয়ে গেছে। এই কড়া রোদের মধ্যে তার জন্য একটি সুদর্শন ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে কথাটি ভাবতেও তার ভালো লাগে।
অনেকক্ষণ দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভোগার পর দোকানে যাবারই সিদ্ধান্ত নেয় উষা। ছেলেটিকে আরো ভাল করে বাজিয়ে দেখা প্রয়োজন।
মা খুব বিরক্ত হলেন। –এই দুপুরবেলা আবার কোথায় যাচ্ছিস?
–কোন খাবো।
–কি রাত দিন আইসক্রীম খাস। গলা ফুলে ঢোল হয়ে যাবে তো।
–গেলে যাবে।
মা কট্‌মট্‌ করে তাকালেন। –ইউনিভারসিটিতে পড়তে গিয়ে খুব লায়েক হয়েছিস, না? বাবা মায়ের কথা আর কানে যায় না?
উষা নিরু ত্তরে গেট পেরিয়ে রাস্তায় নামে। ছেলেটি তাকে দেখা মাত্র উল্টে ঘুরে ব্যাক সপে ঢুকে যায়। পেটের ভেতর থেকে কুলকুলিয়ে উঠে আসা হাসিটিকে অনেক কষ্টে দমন করতে হয়। এমন মজার মানুষ সে আর কখনো দেখেনি।
দোকানী ছেলেটি উষাকে দেখেই এক গাল হাসে, আসেন আপা, আইসক্রীম খাবেন তো?
উষা নির্বিকার মুখে মোর্শেদের পাশের চেয়ারটিতে বসে পড়ে, দুটো বানাও।
ছেলেটি কাজে লেগে যায়। মোর্শেদ গভীর মনোযোগ দিয়ে হাতের ফান্টার বোতলটি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে।
–আপনাকে আমি পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবো, উষা অটুট গাম্ভীর্য নিয়ে বলে।
এই আচমকা প্রস্তাবে মোর্শেদ বাক হারা হয়ে পড়ে।
কি ব্যাপার, কথা বলছেন না যে বড়? প্রতিদিন আমাদের বাড়ির সামনে এসে হাড় হাভাতের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে আপনার আপত্তি নাও থাকতে পারে, কিন্তু আমার যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। আপনাকে আমি সেদিন ফোনে নিষেধ করে দিয়েছিলাম, কিন্তু তারপরও আপনি এসেছেন।
–না মানে আমিতো ঠিক ... এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস ....
–একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে বুঝি দুঘণ্টা লাগে?
–সে কি, এর মধ্যেই দুঘণ্টা পেরিয়ে গেলো। আমিতো খেয়ালই করিনি। আমার কতো জরু রি কাজ পড়ে আছে...
খবরদার, মিথ্যা কথা বলবেন না। মিথ্যা কথা আমি একদম সহ্য করতে পারি না। আপনি আমাকে দেখার জন্যই এখানে বসে আছেন, ঠিক না?
মোর্শেদ চুলে হাত বোলায়, ঠিক।
ঠোট টিপে হাসলো উষা। দেখাতো হলো, কথাও হলো। এবার বাড়ি যান।
মোর্শেদ অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে ঝট করে উঠে দাঁড়ালো।
–কি হলো, সত্যি সত্যিই চলে যাচ্ছেন নাকি?
–যেতেই যখন বলছেন।
–আমি বললেই আপনি যাবেন নাকি? আমি আপনার কে হই? তাছাড়া এখনি আপনার যাওয়া হবে না। দুটো কোনের অর্ডার দিয়েছি। আপনার ভাগেরটা খেয়ে যান।
–না থাক, আজ আমি বরং চলেই যাই।
–না, আপনি যাবেন না। বসুন তো।
মোর্শেদ বসে পড়ে। দোকানী ছেলেটি হাসতে হাসতে দুজনার দিকে দুটি আইসক্রীম বাড়িয়ে দেয়। আইসক্রীম বস্তুটি মোর্শেদের আদৌ সহ্য হয় না। দাঁত সিরসির করে। কিন্তু আপত্তি করতে পারলো না। ওর অস্বস্তিটুকু উষার দৃষ্টি এড়ালো না।
–কি ব্যাপার, আপনার ভাব দেখে মনে হচ্ছে আপনাকে যেন কেউ কুইনিন খাওয়াচ্ছে?
–আমি ঠাণ্ডা জিনিষ খেতে পারি না। দাঁত সিরসির করে।
–কোল্ড ড্রিঙ্কসতো ঠিকই খেলেন।

–ওটা কোল্ড ছিলো না। রোদে রেখে গরম করে নিয়েছিলাম।
উষা উদাস গলায় বললো, যারা আইসক্রীম পছন্দ করে না তাদেরকে আমি মানুষ বলেই গণ্য করি না।
–সে কি অন্যায়। সব জিনিষ কি সবার ভালো লাগে?
–অত শত বুঝি না। আমার যা ভালো লাগে তা অন্যের ভালো লাগবে না কেন?
অত্যন্ত অযৌক্তিক যুক্তি। মোর্শেদ মনে মনে একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। তার কপালে অনেক ভোগান্তি আছে।
–ঠিক আছে, আপনি যদি বলেন তাহলে কাল থেকে আমিও আইসক্রীম খেতে শুরু করবো।
–কেন, আমি একটা অন্যায় আব্দার করলেই আপনি শুনবেন কেন?
–না শুনে উপায় কি? আমার মাথার কি এখন কোন ঠিক ঠিকানা আছে?
উষা কলকলিয়ে হেসে উঠলো। –আরে, আপনি দেখছি রোমিওকেও হার মানাবেন।
–তা আপনার যা খুশি বলুন, কিন্তু ...
–আর কিন্তু নয়, ঝটিতে উঠে দাঁড়ালো উষা, আমার আম্মা হুজুর দুখানি সার্চ লাইট জ্বেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি যাই। আর হাঁ, আপনাকে কষ্ট করে আইসক্রীম খেতে হবে না। ওসব আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম।
উষা দ্রুতবেগে বাসার দিকে চলে যায়। ওর মায়ের সাথে মোর্শেদের চোখাচোখি হলো। চোখ ফিরিয়ে নিলো মোর্শেদ। ভদ্র মহিলা যেন বিরল প্রজাতির হুতোম প্যাচা দেখছেন। এইবার একটি প্রকাশ্য দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সে। ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন।

পরদিন সদলবলে বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজিরা দিলো মোর্শেদ। ইংরেজি বিভাগটি খুঁজে বের করতে প্রচুর সময় লেগে গেলো। আর্টস ফ্যাকালটির দালানটি যে একটি গোলক ধাঁধা বিশেষ, এটি ওদের কারোরই জানা ছিলো না।
উষাদের ক্লাশ হচ্ছে। মোর্শেদ সবাইকে নিয়ে কিছুটা দূরে সরে গেলো। এই বুদ্ধিটি মুকিতের মাথা থেকে এসেছিলো। মোর্শেদ প্রথমে আপত্তি করেছিলো। বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক সুবিধার জায়গা নয়। হয়তো উষার তিনগণ্ডা রূপমুগ্ধ প্রেমিক রয়েছে, বেতাল কিছু দেখলেই তারা হৈ–হৈ রবে ছুটে এসে সটান ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়বে। কিন্তু তার আপত্তিকে কেউ বিশেষ পাত্তা দেয়নি। রাসেল কড়া ধমক দিয়েছে, আপনাকে দিয়ে কিছুই হবে না। প্রেম করতে গেলে অনেক ঝুঁকি নিতে হয়। তাছাড়া আমরা আছি না। জাকের তার সদ্য প্রস্ফুটিত বাইসেফ দেখিয়ে দিয়েছে। মুগুর ভাজা শরীর। ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়লেই হলো? পিটিয়ে তক্তা বানাবো না।
মোর্শেদ মনে মনে প্রমাদ গুনেছে। সত্যিকারের বিপদের সময় এই বীর পুরুষেরা কে কোথায় যাবে কে জানে। তাছাড়া, এখানে আসার কোন অর্থও হয় না। উষা হয়তো বিরক্ত হবে। চোখ মুখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকবে। অথবা তাকে পুরোপুরি না দেখার ভান করে অন্য দিকে চলে যাবে। আশঙ্কায় তার বুক টিবটিব করতে লাগলো। এই সমস্ত অকালপক্ষ ছেলেগুলির বুদ্ধিতে চললে তার সর্বনাশ হতে বেশি সময় লাগবে না।
উষা কোন অস্বাভাবিক আচরণ করলো না। চারজন বান্ধবীকে নিয়ে সহজ গতিতে এগিয়ে এলো।
–এই যে ভদ্রলোক, আপনি এখানে কি করছেন? যতদুর জানি আপনি পড়াশোনার পাট বেশ আগেই চুকিয়ে ফেলেছেন। তাই না?
মোর্শেদের কান লাল হয়ে উঠলো। সে ঘন ঘন মাথায় হাত বোলাতে শুরু করলো। –না মানে, একটু ঘুরতে এসেছিলাম।
–ঘুরতে এসেছেন। কেন, এটা কি রমনা পার্ক?
–না না, তা হবে কেন?
–দেখুন এমন ন্যাকা সাজবেন না। আপনি কেন এসেছেন সেটা আমি বেশ ভালো করেই জানি।
মোর্শেদ অপরাধীর মতো হাসতে লাগলো। উষার বান্ধবীরা বেশ কৌতুহল বোধ করছে। তারা উষাকে ক্রমাগত খুঁচিয়ে যাচ্ছে।
–কি রে, কি ব্যাপার?
উষা মুচকি হাসছে। –কি সাহেব, বলে দেবো কি ব্যাপার?
উষা সুললিত স্বরে হেসে উঠলো। তার নিটোল সুখদৃশ্য শরীরখানিতে প্রচণ্ড ঢেউয়ের সৃষ্টি হলো। মোর্শেদ একটি হৃদস্পন্দন হারালো। উষা মসৃন ববছাট চুলে মৃদু আলোড়ন তুলে বললো, এখানে কেন এসেছেন তা কিন্তু এখনও বলেন নি।
–আপনি তো জানেন।
–হয়তো আমার জানাটা ঠিক নয়।
মুকিত ফিক্ করে হেসে ফেললো। –আপনি বড্ডো শয়তান উষা আপা। সব জেনেও না জানার ভান করেন।

–হা, তোমাকে বলেছে? জানো, তোমাদের এই সিনিয়র বন্ধুটির আদেখলেপনায় আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ঘরে বাইরে সবখানে আমার পেছনে ছায়ার মতো লেগে রয়েছেন। তুমি বড্ডো ত্যাদোড় হয়েছো। আমি কোথায় পড়ি না পড়ি তা ওকে বলতে গেছো কেন?
–আরে না, আমি বলতে যাবো কোন দুঃখে?
–না, তুমি আবার বলনি। গুপ্তচর কোথাকার।
উষার বান্ধবীরা এতক্ষণে ঘটনাটি কিছুটা হৃদয়াঙ্গম করতে সক্ষম হলো। তারা কলকলিয়ে ছলছলিয়ে হেসে উঠলো। মোর্শেদের মনে হলো, সে একটি কমেডি ছবিতে ভাঁড়ের ভূমিকায় অভিনয় করছে। লজ্জায় তার মাথা কাটা যাচ্ছে।
মোর্শেদের আরক্তিম মুখ দেখে উষা আরো উৎসাহিত হয়ে উঠলো।
–ইসরে, আপনি দেখি একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠেছেন। এতো নার্ভাস হবার কি আছে? আমাদের বাসার সামনে সারাদিন গাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে তো একটুও লজ্জা পান না। একবার তো পুলিশের খপ্পরে পড়েছিলেন। অথচ এখন এই কটা মেয়েকে দেখেই নাক, কান লাল করে ভিমড়ী খাবার জোগাড়। কেমন পুরু ষ আপনি?
প্রবল হাসির গর্জনে মোর্শেদের কান ঝালাপালা করে উঠলো। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা, রাসেলরাও হেঃ হেঃ করে সেই হাসিতে যোগ দিয়েছে। ঘরের শত্র বিভীষণ।
উষা লক্ষ্য করলো, ছেলেটি প্রচণ্ডরকম অশ্বস্তি বোধ করছে। হয়তো মেয়েদের সাথে মিশতে সে অভ্যস্ত নয়। একদিনের জন্য ভোজটা যথেষ্ট বেশি হয়ে গেছে। এবার রেহাই দেয়া দরকার। সে কণ্ঠস্বর যথেষ্ট লঘু করে বললো, আপনারা তাহলে ঘোরাঘুরি করু ন, আমরা যাই।
মোর্শেদ বললো, কোথায় যাবেন?
–আমরা কোথায় যাই বা না যাই তা দিয়ে আপনার কি দরকার? আপনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঘুরতে এসেছেন। ঘুরু ন না। আমরা তো আপনাকে অযথা বিরক্ত করছিলাম।
–কি যে বলেন? বিরক্ত করতে যাবেন কেন।
–বিরক্ত হচ্ছিলেন না বুঝি? যে রকম ঘন ঘন ঢোক গিলছিলেন তা দেখেই ভাবলাম। উষা দাঁড়ালো না। অদম্য হাসির প্রকোপ ওড়নার নিচে ঢাকা দিয়ে ছুটে পালালো। বান্ধবীরা তাকে অনুসরণ করলো, এই উষা, দাঁড়া, দাঁড়া।
মোর্শেদ ঘাড় ঘুরিয়ে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে উষাকে পরখ করতে লাগলো। উষা তাকাচ্ছে না। সে মুখ থেকে ওড়না সরিয়ে প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়েছে।
রাসেল হাসা–হাসিতে কান দিলো না। সে চোখ গরম করে মোর্শেদের মুখোমুখি দাঁড়ালো। –আপনি উষা আপাদের বাড়ির সামনে গিয়ে টহল দিয়েছেন এ কথাটা আমাদেরকে বলেন নি কেন? আমরা কি উষা আপাকে খেয়ে ফেলতাম?
মোর্শেদ ছেলেমানুষের মতো হাসতে লাগলো।

মোর্শেদ খুব বিপদে পড়েছে। মেয়েটির মনোভাব আদৌ স্পষ্ট নয়। প্রেম নিবেদনের পাঠটি এখনই সেরে ফেলা উচিত কিনা তা নিয়ে সে খুব দ্বিধায় ভুগছে। হৃদয়ের দিক থেকে প্রতিটি মেয়েই এক একটি রহস্যের ভাণ্ডার। তারা কখন যে কাকে ভালোবাসবে সেটি জানার কোন উপায় নেই। কিন্তু এভাবেও আর চলে না। এইবার যা হোক একটি এসপার ওসপার কিছু হওয়া প্রয়োজন।
তবে গহীন অন্ধকারে একটুখানি আশার আলো দেখা যাচ্ছে। রাসেলের ক্রমাগত হুমকির মুখে মুকিত খানিকটা ঝুঁকি নিতে রাজি হয়েছে। এখন মুকিতকে ভালো ভাবে শিখিয়ে দেয়া হচ্ছে।
–প্রথমে উষা আপার কাছে মোর্শেদ ভাইয়ের ম্যালা প্রশংসা করবি। রাসেল গম্ভীর মুখে বোঝাচ্ছে, তারপর জানতে চেষ্টা করবি, মোর্শেদ ভাই সম্বন্ধে উষা আপা কি ভাবছে? বুঝলি?
মুকিত অসহায়ভাবে মাথা নাড়ে। –বুঝলাম। কিন্তু মোর্শেদ ভাই সম্বন্ধে আমি তো কিছুই জানি না, প্রশংসা করবো কি করে?
–তুমি শালা নেদু খোকা, দুদু খাও? কারও প্রশংসা করতে গেলে তার সম্বন্ধে আবার কিছু জানা লাগে নাকি? যা মুখে আসবে তাই বলবি, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ন, দানশীল, হৃদয়বান কোমল স্বভাব ইত্যাদি যতো রকম গুনটুনের নাম আছে, সব ভরে দিবি।
–না না ভাই, এতো কিছু বলার কোন দরকার নেই। আমি তো আর নবী–রসুল নই। তুমি শুধু উষাকে বুঝিয়ে বলবে যে ওকে না পেলে আমার জীবনটা ছারখার হয়ে যাবে।

রণক আপত্তি করলো, ছারখার কেন, বলেন আত্মহত্যা করবেন। যার প্রেমে দিনভর দিওয়ানা হয়ে আছেন তাকেই যদি আপন করে না পেলেন, তাহলে কিসের জন্য বেঁচে থাকা?
–না না, আত্মহত্যা শব্দটা খুব ছেলেমানুষী শোনাবে। ওসব তোমাদের মানায়, কিন্তু আমার জন্য... উহু, উষা তো উষা, এই কথা একটা ছাগলও বিশ্বাস করবে না।
রাসেল বললো, বিশ্বাস করানোর দায়িত্বটা মুকিতের।
মুকিত মুহূর্তে মুখমণ্ডল কাঁদো কাঁদো করে ফেললো। এই কাজটা আমি পারবো না দোস্ত। আমার ছোট খাটো মিথ্যে কথাও সবাই ধরে ফেলে। সেদিন মার ড্রয়ার থেকে দুশোটা টাকা মেরে দিয়ে খুব কায়দা করে 'নেইনি' বলেছিলাম। মা সোজা আমার চুল টেনে ধরে বললো, টাকা বের কর, জলদি। কেমন বিপদ দ্যাখ দেখি। উষা আপা সাংঘাতিক চালাক মেয়ে, আমার একটা কথাও বিশ্বাস করবে না।
–বিশ্বাস করা না করাটা উষা আপার ব্যাপার। তোর দায়িত্ব বলার, তুই বলবি, ব্যাস।
মুকিতের কোন উপায় থাকে না, তাকে বাধ্য হয়েই সম্মতি জানাতে হয়।

উষা মুকিতের একটি কথাও বিশ্বাস করে না।
–আত্মহত্যার প্ল্যানটা কার?
–রণকের।
–রণকটা কে?
–আমাদের বন্ধু।
–মোর্শেদ সাহেব কি এখন তোমাদের বুদ্ধিতেই চলছেন?
–না না , তা হবে কেন? উনি খুব বুদ্ধিমান মানুষ।
–তাই নাকি?
–অবশ্যই। আর শুধু কি তাই, উনি যেমন সত্যবাদী তেমন ন্যায়পরায়ন যেমন দানশীল তেমন হৃদয়বান, যেমন ...
এক থাপ্পড় মেরে তোমার বত্রিশ পাটি দাঁত ফেলে দেবো। –ভেবেছো ঐ লোক সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না? ওর নামে থানায় দুদুটো কেস হয়েছিলো, তা জান? এই তো কবছর আগেও রাস্তা ঘাটে হকিষ্টিক নিয়ে মারপিট করে বেড়াতো। এক জনের মাথা ফাটিয়ে সর্বনাশ ঘটিয়ে ফেলেছিলো। আর কি, লোকটা মরতে মরতে বেঁচে যায়।
–বলেন কি, এতো দেখি খুনে ডাকাত। আমি তো এসবের কিছুই জানতাম না।
–মুখ সামলে কথা বলবে মুকিত, যার সম্বন্ধে কিছুই জানো না, তাকে খুনে ডাকাত বলছো কেন?
মুকিত অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে যায়। উষার কথাবর্তা তার কাছে হেয়ালীর মতো মনে হয়। –না মানে আপনিই তো বললেন...
উষা হেসে ফেললো। –তুমি একটা আস্ত বোকা এবং তোমাদের মোর্শেদ ভাই হচ্ছে বোকার সর্দার।
–মানে?
–মানে তোমার মুণ্ডু। তাকে গিয়ে বলবে রাস্তা ঘাটে দাঁড়িয়ে প্রেম করার সাধ নেই আমার।
–মানে আপনি...
–কি শুধু মানে মানে করছো? জানো আমার বন্ধবীরা সবাই ম্যাকডোনাল্ডসে ডেটিং করে। আর আমার এমনই কপাল, চমক ল্যাক সপে গিয়ে মোলাকাত করতে হয়।
মুকিত বিস্ময়ে অভিভুত হয়ে পড়ে। সম্পূর্ণ ব্যাপারটিই তার কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। –মোর্শেদ ভাইকে তাহলে কি বলবো।
–তুমি আবার কি বলবে। আমার ফোন নাম্বার তো তার জানাই আছে, আজ সন্ধ্যায় রিং করতে বলবে।
মুকিত উষাদের বাড়ি থেকে বেরিয়েই ইসলামপুর ছুটলো। খবরটা শোনার পর মোর্শেদ ভাই নির্ঘাত আজকে হার্ট ফেল করবেন। বিধাতার এক আজব সৃষ্টি এই নারী জাতি, এতোদিন এতো ঢং দেখিয়ে এখন কিনা ডেটিংয়ের বায়না ধরছে। সোবাহানাল্লাহ।
মোর্শেদের হার্ট এটাক হলো না, তবে তার হৃৎকম্পন এতো দ্রুততর হয়ে উঠলো যে ফুল স্পীডে পাখা চালিয়ে তার নিচে পাক্কা দশ মিনিট বসে থাকলো। এতো অল্পতেই উষা সম্মত হবে তার ধারণাই ছিলো না।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে ডেটিংয়ের স্থান নিয়ে। নানা মুনির নানা মত। রাসেল এবং রণক ম্যাকডোনাল্ডসের পক্ষে, সাব্বির এবং শাহেদ বু-লেগুনের, মজনু কফি হাউসের। মুকিত এসব ব্যাপারে একেবারেই অনভিজ্ঞ, সে প্রত্যেকের পক্ষেই তার দৃঢ় সমর্থন জানিয়ে পরিস্থিতিকে অধিকতর জটিল করে তুলছে।
অনেক বিতর্কের ঝড় তুলেও যখন এই সমস্যার কোন সমাধান হলো না, তখন মোর্শেদকেই বিচারক মানা হলো।
–আপনি যা বলবেন তাই হবে। রাসেলের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন হুমকি।
মোর্শেদ মনে মনে প্রমাদ গুনলো। এই ছেলেটির রাগ বেশি, একে ক্ষেপিয়ে তোলা মোটেই উচিৎ হবে না।
–ভায়া, আমরা পুরানো ঢাকার মানুষ, পড়াশোনাও করেছি জগন্নাথে, এদিককার খবরাখবর খুব একটা রাখি না। তোমরা যেটাকে ভালো মনে করো, সেখানেই যাবো।
–ম্যাগডোনাল্ডস।
–বু-লেগুন।
–কফি হাউস।
দুবার রিং বাজতেই রিসিভার তোলা হলো। –হ্যালো?
–হ্যালো, মিস উষা আছেন?
–জ্বি আছেন, এবং তিনি কথা বলছেন। গলার স্বর শুনেই চিনে ফেলা উচিৎ ছিলো।
এমনধারা ধমকের জন্য মোর্শেদের কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছিলো না। সে তোতলাতে শুরু করলো। –না মানে...
–বুঝেছি, আপনাদের সবাইকে মানে রোগে পেয়েছে। যাইহোক ফোন করেছেন কেন তাই বলুন?
মোর্শেদ এবার সত্যিই ঘাবড়ে যায়। মেয়েটি এমন রাগী গলায় কথা বলছে কেন? এইটুকুন সময়ের মধ্যেই সিদ্ধান্ত পালটে ফেললো নাকি?
রাসেল ঝাঁঝিয়ে উঠলো, কি হলো? বোবা বনে গেলেন কেন? কথা বলুন।
সাব্বির মন্তব্য ছুড়লো, অধিক সুখে পাথর।
ওদিক থেকে উষার তিক্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, কি ব্যাপার বলুন তো, সাহস করে যদি আমাকে ফোনই করতে পারলেন, তাহলে দুটো কথা বলতে এতো ভড়কে যাচ্ছেন কেন?
–না না ভড়কে যাবো কেন? কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনার মেজাজটা এখন ভালো নেই।
–আমার মেজাজের আপনি কি ঘোড়ার ডিম বোঝেন? মুকিতের সাথে আপনার দেখা হয়েছে?
–জ্বি হয়েছে।
–ও আপনাকে কিছু বলেনি?
–বলেছে, কিন্তু কথাটা ঠিক বিশ্বাস হয়নি।
–এর মধ্যে আবার অবিশ্বাসের কি আছে। নাকি দুপুর রোদে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতেই আপনার আনন্দ?
–ধ্যাৎ, তা হবে কেন!
–তাহলে যাচ্ছেন?
–নিশ্চয়।
–কোথায়?
রাসেল চেচিয়ে উঠলো, ম্যাগডোনাল্ডসে।
উষা অবাক হয়ে জানতে চাইলো, কথা বললো কে?
–রাসেল।
–বাঁদরগুলোর সবকটাই আছে নিশ্চয়?
–হ্যাঁ।
–আমরা কোথায় ডেটিং করবো সেটাও বোধ হয় ওরাই ঠিক করে দিয়েছে, নাকি?
–নাহ এখনও ঠিক করতে পারেনি। তিনটে দল পাকিয়ে হাতাহাতি করার মতলব কষছে।
উষা হেসে উঠলো। –কে কি বলছে শুনি।
–একদল বলছে ম্যাগডোনাল্ডস।
–উহু। ওখানে আমার সব বান্ধবীরা যায়। অন্য কোথাও যেতে হবে।

–বু-লেগুন ।
–ওটা আবার কোথায় ।
–তাই তো । জায়গাটার নামটাতো শোনা হয় নি, দাঁড়ান জেনে নিচ্ছি ।
–থাক, আর জানতে হবে না । ছাগল কোথাকার । তিন নম্বরটা কি তাই বলুন ।
–কফি হাউস? চলে । চেনেনতো, নাকি বাসায় গিয়ে তুলে নিয়ে আসতে হবে ।
–না না, তার কোন দরকার নেই । আমি ঠিকই চিনে নেবো ।
–অর্থ্যাৎ চেনেন না ।
–চিনি না, তবে ঠিকই পৌঁছে যাবো ।
–দেখবেন আবার সদরঘাটে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন না । উষা প্রবল বেগে হাসতে লাগলো ।
–মিস উষা, আপনি সত্যি সত্যিই আসবেন তো?
–তবে কি ভেবেছেন আপনাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবার মতলব আটছি ।
–তেমন কাজ যে আপনারা করেন না, তা তো নয় ।
–কি করবো বলুন, আপনারা যদি নাক বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন বাধ্য হয়েই এই দায়িত্বটুকু পালন করবে হয় ।
দুজনে একসাথেই হেসে উঠলো । দুজনার হাসির সম্মিলিত ধ্বনিটি মোর্শেদের কানে বড় সুমধুর শোনায় ।
–আপনি আসুন বা না আসুন, আমি কিন্তু যাচ্ছি ।
–আরে বাবা বললামইতো যাবো । সব মেয়েকে এক রকম ভাবেন কেন বলুন তো? যাইহোক কাল সন্ধ্যা ঠিক সাতটায় যাবো । গিয়ে যেন আপনার শ্রীবদনখানি দেখতে পাই ।
–বিশ্বাস কর ন, পাঁচটার সময় গিয়ে হাজির হবো ।
–জ্বি না, পাঁচটার সময় যেতে হবে না । সাতটার আগে পৌঁছলেই চলবে । মা এদিকে আসছে । রাখি তাহলে । মনে থাকে যেন, কাল সন্ধ্যা ঠিক সাতটায় ।
রিসিভার ক্রাডলে রেখেই মোর্শেদ হুংকার ছাড়লো, সেলিম ।
–জে, ভাইজান ।
–যেখানে যতো খাবার–দাবার পাস সব নিয়ে আয় । আজ আমার বড় আনন্দের দিনরে । ইচ্ছে হচ্ছে নেচে গেয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেই ।
সেলিম একগাল হেসে বললো, আপনার হেই ডিসকো ড্যানসটা একপাক নাইচাই লননা । দ্যাখতে কিন্তু ব্যাশ লাগে ।
রণক বললো, মোর্শেদ ভাই, আপনি নাচতেও পারেন নাকি?
রাসেল কড়া গলায় বললো, আপনাকে নাচতেই হবে । বিশেষ আপত্তি করলো না মোর্শেদ । দীর্ঘ তিন চার মিনিট ধরে অযৌক্তিকভাবে বাতাসে হাত পা ছুড়ে নাচের কসরত করলো সে । এই ধরনের কসরতকেই সাদা বাংলায় ডিসকো ড্যানস বলা হয় ।

তিন

কাঁটায় কাঁটায় সাতটার সময় কফি হাউসে ঢুকলো উষা। মিনিট পাঁচেক আগেই পৌঁছেছিলো সে, এই সময়টুকু ফুটপাতে দাঁড়িয়ে অপচয় করতে হয়েছে। সে চায় না মোর্শেদ তার উদগ্রীবতাটুকু ধরে ফেলুক। কফি হাউসের ভেতরে স্বাভাবিকভাবেই বেশ ভীড়। তবুও আটজনের বাহিনীটিকে সনাক্ত করতে তার বিশেষ কষ্ট হলো না।
উষাকে দেখেই স্প্রিং দেয়া পুতুলের মতো লাফিয়ে চেয়ার ছাড়লো মোর্শেদ। –আপনি এসেছেন।
–আরে বাহ, আপনি কি ভেবেছিলেন আসবো না।
–খুব একটা ভরসা পাচ্ছিলাম না অবশ্য।
–আপনি মনে হচ্ছে ঝগড়া করার জন্য কোমর বেধে এসেছেন?
–ধ্যাত, তা কেন হবে? বসুন।
রাসেলরা উঠে পড়লো। –মোর্শেদ ভাই, আমরা তাহলে যাই। আপনারা গল্প স্বল্প কর ন।
রণক খুক খুক করে কাশতে লাগলো। সাব্বির গাম্ভীর্য নিয়ে বললো দেখবেন, এবার কিন্তু চিড়িয়া ধরাই চাই।
উষা চোখ গরম করলো, এই ছেলে, কাকে চিড়িয়া বলছো?
শাহেদ বিষন্নস্বরে বললো, ওর কথা বাদ দিন, উষা আপা। ওর মতো রামছাগল সৌন্দর্য্যের কি বোঝে?
–তুমি মনে হচ্ছে অতিরিক্ত বুঝে ফেলেছো?
–বিশ্বাস কর ন উষা আপা, আপনাকে আজ ভিষণ সুন্দর দেখাচ্ছে। যেন স্বর্গের অপসরী।
উষা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো। তাহলে তোমাকেই বত্রিশ পাটি দাঁত ভেঙে ফেলার হুমকি দিয়েছিলাম?
শাহেদ চোখ মুখ অন্ধকার করে দূরে সরে গেলো। উষা হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলে কারো কাছে আর মুখ দেখানো যাবে না।
মোর্শেদ অবাক হয়ে জানতে চাইলো, বলেন কি, কেন? উষা হেসে ফেললো, থাক ওসব, ছেলেটা লজ্জা পাচ্ছে।
এদের দুজনকে নিভৃতে রেখে বিদায় নেবার আদৌ কোন ইচ্ছা নেই রাসেলের। সে আরেকটু চড়া গলায় বললো, আমরা তাহলে যাই, মোর্শেদ ভাই, পরে আবার দেখা হবে।
–আরে না, যাই বললে যেতে দেবো নাকি? সবাই বসে পড়ো। একসাথে গল্প করি।
–হ্যা, আপনি আমাদেরকে গাধা পেয়েছেন আরকি। উষা আপা ডেটিং করতে এসেছেন আপনার সাথে। আমরা বোকার মতো বসে থাকবো কেন?
কি আশ্চর্য, এই মেয়েটার সামনে আমাকে একাকী বসিয়ে রেখে তোমরা চলে যাবে? ও যদি স্যান্ডেল হিল দিয়ে আমরা পায়ে গুতা মারে, তখন?
উষা পা থেকে স্যান্ডেল খুলে সবাইকে দেখিয়ে দিলো। ফ্লাট হিল।
মোর্শেদ হেসে উঠলো। ঠিক আছে রাসেল, তোমরা ঐ টেবিলটাতে বসো। যা ইচ্ছা খাও, লজ্জা করো না।
এই প্রস্তাব সবারই মনপুত হলো। তারা হৈ চৈ করে একটি টেবিল দখল করলো এবং মোর্শেদের মাথায় কাঠাল ভাঙার আয়োজন করতে লাগলো। মোর্শেদ নিজেদের জন্য দুটি চিকেন বার্গারের অর্ডার দিলো।
–কফি?
উষা মাথা নাড়লো। হু।
–দু কাপ কফি।
ওয়েটার অর্ডার নিয়ে চলে গেলে উষা এবং মোর্শেদ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লো। কিভাবে কথা শুর করা যায় মোর্শেদ কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না, সে মুগ্ধ চোখে উষাকে দেখছে। মেয়েটি হালকা সবুজ রঙের ঢিলা সালোয়ার কামিজ পরেছে, ফিনফিনে ওড়নাটি হালকাভাবে সুডৌল স্তনযুগলের উপর ঝুলছে, প্রায় প্রসাধনহীন সুন্দর মুখটিকে স্বল্প আলোকে অদ্ভুত কোমল এবং দীপ্তিময় মনে হচ্ছে। মোর্শেদকে মোহাবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে উষা আরক্তিম হয়ে উঠলো।
–কি ব্যাপার, অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছেন কেন?
শাহেদ ঠিকই বলেছে, আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে।
যে সুন্দর তাকে তো সুন্দর লাগবেই।
–তা তো বটেই। তবে কিনা আমার বড় ভয় হয় আপনার পাশে আমাকে বড্ডো বেমানান লাগবে। আমি হলাম গিয়ে ঘটোৎকচ, অথচ আপনি দুধের মতন ফর্সা।

উষা মৃদুগলায় হেটে উঠলো। হ্যা, আপনাকে বলেছে। আপনি কালো ঠিকই, কিন্তু ঘটোৎকচ নন। ছেলে হিসেবে আপনি খুব হ্যান্ডসাম।
–সত্যি বলছেন?
–জ্বি সত্যিই বলছি। কারণ তা না হলে আমি আপনাকে পাত্তাই দিতাম না।
–বলেন কি? মেয়েরা কি শুধু চেহারা দেখে নাকি?
–অন্যদের কথা জানি না। আমি দেখি, ব্যাস।
ওয়েটার কফি এবং বার্গার পরিবেশন করলো। উষা বললো, আমি যখন আজিমপুর গার্লস স্কুলে পড়তাম তখন আপনাকে কয়েকবার দেখেছিলাম। স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে খুব আড্ডা দিতেন।
–আপনাকে তখন দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।
–দেখেছেন হয়তো, মনেই নেই। স্কুল জীবনে আমি খুব হ্যাংলা পাতলা ছিলাম কিনা, ছেলেরা তেমন একটা আগ্রহ দেখাতো না।
–ভালই হয়েছে, নইলে আমি হয়তো আপনাকে পেতাম না।
–মানে? আপনি কি ধরেই নিয়েছেন যে আমাকে অলরেডী পেয়ে গেছেন?
মোর্শেদ বোকার মতো হাসতে লাগলো।
উষা ঠোটের ফাঁকে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে প্রশ্ন করলো, একটা কথা জানতে চাইবো, সত্যি করে বলবেন?
–একটা কেন, হাজারটা প্রশ্ন কর ন না।
–আপনার কি সত্যিই কখনো কোন এফেয়ার ছিলো না।
–খোদার কসম, ছিলো না। বিশ্বাস কর ন।
–আরে বোকা, আপনাকে আবার কসম কাটতে বললো কে? আমি তো মজা করবার জন্য জানতে চাচ্ছিলাম।
–ও, তাই বলুন।
মোর্শেদ অপ্রস্তুত বোধ করে। উষার মধ্যে কোন রকম দ্বিধার চিহ্ন দেখা গেলো না। সে নানা বিষয়ে সহজ স্বরে আলাপ করতে লাগলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই কথার সমুদ্রে ভেসে গেলো তারা। বার্গার দুটি কুমারীত্বের দুঃখে হাহাকার করতে লাগলো এবং দুকাপ কফি দ্রু ত তাপ বিকিরণ করে শীতল হয়ে উঠলো।
সে রাতে মোর্শেদের পকেট থেকে পাঁচশত পঞ্চান্ন টাকা খসিয়ে রাসেলরা জয়ের আনন্দে চোখ–মুখ অত্যুজ্জল করে ফেললো। উষা দুচোখ বিস্ফোরিত করে বিচ্ছুগুলির আপাদমস্ত ক নিরীক্ষণ করলো। ওরে বাবা, এ যে দেখি পঙ্গপাল।
পঙ্গপালেরা পুলকিত চিত্তে হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলো। উষাকে গাড়িতে করে বাসার কাছাকাছি পৌঁছে দিলো মোর্শেদ।
–আবার দেখা হবে তো?
–নিশ্চয় হবে।
–কবে, কখন?
উষা চোখ নাচালো। –এখনই বলবো না। পরে যোগাযোগ করবেন।
–আমি আপনাকে যখন তখন রিং করলে আপনি বিরক্ত হবেন না তো।
–না হয় হলামই। আপনার উপর বিরক্ত হবার অধিকার নিশ্চয় আমার আছে?
–তাতো আছেই, কেন থাকবে না?
উষা নিচু গলায় হাসতে লাগলো। –আপনি খুব ইন্টারেস্টিং মানুষ। অনেক রাত হলো, আমি যাই। আপনি সুযোগ মতো রিং করবেন।
–আজ রাতে?
–জ্বি না। কাল রাতে করতে পারেন।
উষা চলে গেলো। সে গেট পেরিয়ে বাসায় না ঢোকা পর্যন্ত গাড়ি ছাড়লো না মোর্শেদ। মেয়েটিকে যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণই লাভ?
সে রাতে তার খুব ভালো ঘুম হলো। চমৎকার একটি স্বপ্ন দেখে ফেললো। সবুজ শ্যামল এক পাহাড়ী উপত্যকার শরীর বয়ে ছুটে চলেছে সোনালী জলের স্রোতস্বীনি, ওপাশে একটি দ্যুতিময় প্রস্ত র খণ্ডের উপর আলুলায়িত ভঙ্গিতে বসে আছে উষা, তাকে রূপকথার অপরূপ সুন্দরী রাজকণ্যাদের মতো দেখাচ্ছে।

শেষ রাতে ঘুম ভাঙার পরও অপূর্ব সেই দৃশ্যটি মোর্শেদের হৃদয়ের তন্ত্রীতে স্পষ্ট প্রতিধ্বনি তুলতে লাগলো। তার ঠোঁটে এক টুকরো দুষ্টু হাসি ফুটে উঠলো, রাজকণ্যাটির শরীরে কোন আচ্ছাদন ছিলো না।

সন্ধ্যা থেকেই উষা চঞ্চল হয়ে আছে, তার সম্পূর্ণ মনোযোগ টেলিফোনটির উপর। মোর্শেদকে তার খুব পছন্দ হয়েছে, ছেলেটির সহজ সরল চাহনীতে অদ্ভুত এক উষ্ণতা রয়েছে। আজ সারা দিনে উষা প্রচুর চিন্তা ভাবনা করেছে, মনের সাথে বোঝা পড়া করতে যথেষ্ট সময় লেগেছে। আপাতত তার কোন দ্বিধা নেই, মোর্শেদ যদি হৃদয় নেয়ার প্রশ্ন তোলে, তাহলে সে পিছিয়ে যাবে না।

রিং হলো পৌণে সাতটায়। মা ধরতে যাচ্ছিলেন, উষা হুড়–মুড়িয়ে ছুটে এলো। –আমি ধরছি মা।
–কেন, আমি ধরলে অসুবিধাটা কি?
–কোন অসুবিধা নেই। তবে কলটা আমার।
–তোর মানে? রিং শুনেই কি করে বুঝলি যে তোরই ফোন?
–এই সময় একজনের রিং করার কথা আছে।
–থাকলই বা, তাই বলে কি অন্য কেউ হতে পারে না?
উষা মাকে ঘাটালো না। মা ছোটখাটো ব্যাপারেও অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন। সে রিসিভার তুললো। 'হ্যালো?'
মোর্শেদ বলছি।
–ও আচ্ছা। বড্ডো অসময়ে করলেন।
–কেন কি করছিলেন।
–কেন পড়াশুনা করছিলাম। সামনে পরীক্ষা আছে কিনা।
মা অবাক হয়ে বললেন, কি যা তা বলছিস? তুই না সবে সেকেন্ড ইয়ারে উঠলি, এর মধ্যেই আবার কিসের পরীক্ষা?
মোর্শেদ অনুতপ্ত স্বরে বললো, তাহলে খুবই ডিসটার্ব করলাম। ঠিক আছে, আমি না হয় পরেই ফোন করবো।
–না, পরে আর কখন করবেন। যা বলার এখনই বলুন।
আমার খুব খারাপ লাগছে, আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি।
–বেশ চাননি। এখন কি বলবেন তাই বলুন।
–ইয়ে মানে, আপনি বলেছিলেন ...
উষা আড়চোখে মায়ের দিকে তাকালো। বার দুয়েক খুক্ খুক্ করে কাশলো। মা সরলেন না, সম্ভবত তার উঠবার কোন ইচ্ছাও নেই। উষা বেশ বিপদে পড়লো, মায়ের সামনে সব কথা বলা যাবে না। –এই যে শুনন, মিনিট পাঁচেক পরে আবার রিং কর ন না।
–কেন?
–অতো কেন কেন করবেন না। যা বলছি তাই কর ন। রাখলাম।
উষা রিসিভার ক্রাডলে নামিয়ে ফোন সেটটিকে নিজের করে নিয়ে এলো। মা পেছন থেকে প্রশ্ন করলেন, এই উষা, ফোন নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস?
–ঘরে।
–কেন ঘরে কেন?
–কিছু গোপনীয় কথা আছে।
–তোর আবার গোপনীয়তা কি? তুই কি সিক্রেট এজেন্ট?
–আমি নই, তবে তুমি তো বটেই।
–কি, কি বললি? যতো বড় হচ্ছিস, ততো ফাজিল হচ্ছিস, না? আসুক তোর বাবা ...
মায়ের প্রলাপ শোনার জন্য অপেক্ষা করেনি উষা, সে ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজার লক টিপে দিয়েছে। কাঁটায় কাঁটায় পাঁট মিনিট পরে রিং হলো।
–ব্যাপার কি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।
–এতে না বোঝার কি আছে? এবার বুলন, কি বলছিলেন!

–বলছিলাম, সেদিন আপনি আমাকে কোন একটি ব্যাপারে যথেষ্ট আশ্বাস দিয়েছিলেন।
–আমি! কোন ব্যাপারে বলুন তো?
–জ্বি মানে, এই দেখা–টেখা হওয়ার ব্যাপারে।
মোর্শেদের অপ্রস্তুত চেহারাখানি কল্পনা করে উষা প্রচন্ড পুলক অনুভব করলো। হাসি চাপতেও বেশ বেগ পেতে হলো।
–ও তাই বলুন। তা কবে দেখা করতে চান?
–আপনিই বলুন।
–কাল সন্ধ্যায় আমার তেমন কোন কাজ নেই, আপনি চাইলে
–কোথায়? কফি হাউসে? সাতটায়?
–আরে না, বারে বারে এক জায়গায় যেতে ভালো লাগে নাকি? চলনু বু-লেগুনেই যাওয়া যাক।
–বু-লেগুন। দারু ন! কিন্তু ইয়ে, রেষ্টুরেন্টন্টা আমি ঠিক চিনি না। মানে বুঝতেইতো পারছেন ... তবে হ্যাঁ, রাসেলরা চেনে।
–কারা? ঐ পঙ্গপালগুলো? আপনার কসম লাগে ওদেরকে এই ব্যাপারে একটা কথাও বলবেন না। বু-লেগুনের ঠিকানা আমি জোগাড় করবো।
–কি ব্যাপার, হঠাৎ ওদের উপর ক্ষেপলেন কেন? ওরা তো বেশ ভালো ছেলে।
–ভালো ছেলে না ঘোড়ার ডিম। জানের ওদের একজন আমাকে পর পর তিনদিন প্রেম নিবেদন করেছে?
মোর্শেদ হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলো। –নিশ্চয় শাহেদ। সেদিন যে ছেলেটা আপনার খুব প্রশংসা করছিলো।
–নিঃসন্দেহে। কেমন ফাজিল ছেলে দেখুন দেখি? এটা কি ওয়েষ্টার্ণ কান্ট্রি। তাছাড়া বাকীগুলোও এক একটা হাঁড় বজ্জাত।
–তাহলে ওদেরকে বলবো না?
–একদম না। আপনি বিকেল পাঁচটার সময় বেইলী রোডের মোড় থেকে আমাকে তুলে নিয়ে যাবেন।
–আচ্ছা। কিন্তু বলছিলাম কি, রাসেলরা খুব দুঃখ পাবে।
–উহ্, কি শুধু রাসেলরা রাসেলরা করছেন। ওদের সামনে কি সব কথা বলা যায়?
–তা অবশ্য যায় না।
–তা ছাড়া এই বয়সের ছেলেগুলো বড্ডো ফাজিল, ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকে, ছোট বড় বিচার নেই। ঠিক কিনা?
–তা ঠিক।
–তাহলে ওদেরকে আপনি কিছু বলছেন না, ঠিক আছে?
–আপনি যখন বলছেন।
মা দরজায় টোকা দিচ্ছেন। –এই উষা, কি এতো কথা বলছিস ফোনে? আমি এক জায়গায় রিং করবো, ফোনটা দে।
–দিচ্ছি বাবা দিচ্ছি।
মোর্শেদ অবাক হয়ে বললো, কি দিচ্ছেন?
–আপনাকে নয়। মা ফোন চাইছেন, তাকে বললাম। সময়টা খেয়াল রাখবেন, বিকাল পাঁচটায়। আমি কিন্তু পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করেই চলে আসবো। মোর্শেদকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই লাইন কেটে দিলো উষা। দরজা খুললো।
–কার সাথে কথা বলছিলি?
–সুরমা আপার সাথে।
–সুরমার সাথে এতো কি গোপন কথা হচ্ছিলো?
–না, উনি বলছিলেন সেদিন বাসায় ঢুকে দেখেন ওনাদের কাজের ছেলে মেয়ে দুটো নাকি কি সব করছিলো। ধরে বেশ দুঘা লাগিয়ে দিয়েছেন।
–ধ্যাৎ, কি যা তা বলছিস।
মা মুখ লাল করে চলে গেলেন। উষা নিঃশব্দ হাসিতে ফেটে পড়লো।
উষা বেইলী রোডের মোড়ে পৌঁছে দেখলো মোর্শেদ অধীর অপেক্ষায় বসে আছে। ওকে দেখেই তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। –এলেন তাহলে। আমি ভাবলাম বুঝি আর আসবেন না।
–কেনো? এখনো তো পাঁচটা বাজেনি।
–হাতে তো ঘড়ি আছে। সেটার দিকেও তো একবার তাকাতে পারতেন?
–ঘড়ির উপর কোন বিশ্বাস নেই, ওটার কাণ্ডজ্ঞান কম। এক ঘণ্টা পার হতে তিন ঘণ্টা সময় নেয়।

উষা হাসতে লাগলো। –আপনার নিজেরও খুব একটা কাণ্ডজ্ঞান আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। এক ঘন্টা আগে এসে বসে থাকতে কে বলেছিলো?
–কি করবো বলুন? আপনি তো আবার পাঁচ মিনিটের ভয় দেখালেন।
–হয়েছে, একবার গাড়িতে উঠুন।
উষার নির্দেশ মতো শেওড়াপাড়ার দিকে গাড়ি ছোটালো মোর্শেদ। তার চঞ্চল দৃষ্টি রাস্তা ছেড়ে বারংবার পার্শ্ববর্তিনীর উপর স্থির হচ্ছে, ঘন নীল শাড়ীতে উষাকে দারুন মানিয়েছে, গভীর সুমদ্রের মতো মনে হচ্ছে।
উষা ধমক দিলো, কি হলো, দুর্ঘটনা ঘটাবেন নাকি? রাস্তার উপর চোখ রাখুন।
মোর্শেদ অনেক সহজ হয়ে এসেছে, সে বিশেষ অপ্রস্তুত হলো না, নির্লজ্জের মতো হাসতে লাগলো।
বু-লেগুনে তারা একটি কেবিন দখল করলো। মোর্শেদ অস্বস্তি এবং রোমাঞ্চের মাঝামাঝি এক ধরনের অনুভূতি নিয়ে ঘামতে লাগলো। কোন মেয়ের সাথে নির্জন একটি কামরায় বসে থাকার মতো অদ্ভুত অভিজ্ঞতা তার কখনো হয়নি।
উষা বললো, জানেন, বড্ডো ঝামেলায় পড়েছি।
মা রাত দিন আমাকে চোখে চোখে রাখে। একটু বেড়াতে বের হলেও দশ গণ্ডা কৈফিয়ত দিতে হয়। এই যে বেরিয়েছি, কি কি বলে এসেছি জানেন। মুকিতদের বাসায় যাচ্ছি, গল্পের বই আনতে।
–সে কি? উনি খোঁজ নিলেইতো সব বুঝে ফেলবেন।
–ফেললই বা। আমি কি কচি খুকী নাকি যে রাতদিন আমার পেছনে দারোয়ানের মতো লেগে থাকবে?
–তাও ঠিক।
–অতো ঠিক ঠিক করবেন না। আপনি তো পুরুষ মানুষ অতো ঝুট্ ঝামেলা নেই। মেয়ে হবার কি জ্বালা বুঝবেন কি করে?
মোর্শেদ হাসতে লাগলো।
–হাসছেন কেন?
–পুরুষ হবারও অনেক জ্বালা আছে। আমার কাণ্ড কারখানা দেখেও অন্তত আপনার সেটা বোঝা উচিৎ ছিলো।
–ইস, কি জ্বালাতনেই না আপনি পড়ছেন? কষ্টের মধ্যে তো দুটো দিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, ব্যাস।
–শুধু দাঁড়িয়ে থাকাটুকুই দেখলেন, বুকের মধ্যে যে ঝড় উঠছে তার কথা ভাবলেন না?
উষা আকস্মিক আবেগে রক্তিম হয়ে উঠলো। –ছেলেরা সব কিছুই একটু বাড়িয়ে বলে।
–অন্য ছেলেদের কথা বলতে পারবো না, কিন্তু আমি এক ফোঁটাও বাড়িয়ে বলিনি। জানেন, কাল রাতে আপনাকে স্বপ্নে পর্যন্ত দেখেছি। মোর্শেদ মিটি মিটি হাসতে লাগলো।
উষা কপট রাগ দেখাল। –স্বপ্ন দেখেছেন বেশ কথা, তাতে হাসির কি আছে?
–সেটা অবশ্য বলা যাবে না।
–একশ বার বলা যাবে, জলদি বলুন।
–আপনি রেগে যেতে পারেন।
–না, রাগবো না।
–আপনার শরীরে কিছু ছিলো না।
উষা বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে থাকলো। –কি সর্বনাশ। আপনি এমন শয়তান তা তো জানতাম না?
–না না, বিশ্বাস করুন আমি ইচ্ছে করে এমন স্বপ্ন দেখিনি। মানে, স্বপ্ন তো আর ইচ্ছে করে দেখা যায় না। কেমন করে যেন ...
উষার কান গরম হয়ে উঠেছে, ঘাড়ের উপর ঘাম জমেছে। সে রুমাল বের করে ঘন ঘন ঘাম মুছতে শুরু করলো। মোর্শেদ ওর লাজরাঙা ভাব দেখে অত্যন্ত আনন্দ পেলো। দেখা যাচ্ছে, কিছু কিছু ব্যাপারে এই মেয়েটির বেশ স্পর্শকাতরতা আছে। সে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো। একটা কথা বলব, উষা?
উষা মিস শব্দটির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করলো, তার ভালো লাগলো। বলুন না।
–আপনি আপনি করে কথা বলতে আমার খুব খারাপ লাগে। 'তুমি' করে বললে আপনি কি রাগ করবেন?
–বলবেন, আপনার ইচ্ছে হলেই বলবেন?
উহু শুধু আমি একা বলতে রাজী নই। আপনি বললেই তবে আমি বলবো।
দুজোড়া চমকিত আঁখি মুহূর্তের চপলতায় পরস্পরকে ছুঁয়ে যায়। শ্বাস–প্রশ্বাস ঘন হয়ে আসে।

–ঠিক আছে, বললেই হয় ।
–মন থেকে বলছেন?
–হু ।
দীর্ঘক্ষণ কোন কথা হয় না, প্রেমের সবচেয়ে দুরূহ বাঁধাটি তারা অতিক্রম করেছে, নিঃশব্দ অনুভূতি জীবন্ত রূপ ধারণ করেছে । কিন্তু এরপর কি হবে, তা দুজনার কেউই জানে না । তারা অনিশ্চিত ভাবাবেগ নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে ।
ওয়েটার আসে । খাবার সার্ভ করে । চলে যাবার সময় সন্তর্পনে দরজাটি ভিড়িয়ে দিয়ে যায় । সম্ভবত এই ধরনের নীরব মুহূর্ত দেখতে সে অভ্যস্ত ।
পলাতক দৃষ্টি দুটির মিলন হতেই উষা হেসে ফেলে । –পরিবেশটা কেমন যেন হয়ে গেলো তাই না?
–হ্যাঁ হঠাৎ বদলে গেলো ।
–এরা তো বেশ নুডুল্‌স রাঁধে । কি চমৎকার গন্ধ বের চ্ছে ।
–খেয়ে নিলে হয়, নিশ্চয় ক্ষিধে পেয়েছে?
–উহু, রাত নটার আগে আমার ক্ষিধে পায় না । তবে একজনের যে ক্ষিধে পেয়েছে সেটা বেশ বুঝতে পারছি ।
–অস্বীকার করবো না । বেশি টেনশনে থাকলে ক্ষিধেটাও ঘন ঘন পায় । কিন্তু একাকী কি করে খাই?
দুজনই সম্বোধনের ঝুঁকিটুকু সযত্নে পরিহার করে চলছে । বীনার তার হাত দেবার পূর্বে কিছুটা প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে বৈকি । উষা দুটি পেস্টে নুডুল্‌স ঢেলে একটি মোর্শেদের দিকে বাড়িয়ে দিলো, অন্যটি নিজে টেনে নিলো ।
বেশি ঠিক আছে, আমিও না হয় অল্প সল্প খাচ্ছি ।
–তাহলে আমার খেতে আপত্তি নেই । তাছাড়া ক্ষুধায় নাড়ী-ভুড়ি হজম হয়ে যাবার তাল করছে । মোর্শেদ গোগ্রাসে খেতে লাগলো ।
নিঃশব্দে দরজাটি খুলে যায় এবং দুটি চক্‌চকে কৌতুহলী মুখ ভেসে উঠে, মোর্শেদ বিশাল এক টুকরো হাসি উপহার দেয় ।
–আরে রাসেল, রণক, মজনু–তোমরা? এসো এসো । বসে পড়ো । কে কি খাবে অর্ডার দাও ।
রাসেল চোখ ছোট ছোট করে দুজনকে পরখ করলো । –লুকিয়ে লুকিয়ে খুব প্রেম করা হচ্ছে বুঝি?
রণক টিপপনি কাটলো, একে বলে প্রেম । দুজনে কেমন হাউ–মাউ করে খাচ্ছিলো দেখিসনি? যেন জীবনে নুডুলস খায়নি?
উষা চোখ রাঙালো, এই ছেলে, একদম ফালতু কথা বলবে না ।
উষার ধমক শুনে ছেলেগুলির প্রবল কৌতুক বোধ হলো এবং তারা সমস্বরে হাসিতে ফেটে পড়লো । বোঝা গেলো, অভিযান সফল হওয়ায় তারা খুব উৎফুল-হয়ে উঠেছে ।
বিল–আটশত তেইশ টাকা মাত্র ।

চার

মোর্শেদ এবং উষা এবার হাঁড়ে হাঁড়ে টের পেলো, প্রেম করবার কতো জ্বালা । দুদণ্ড স্থির হয়ে বসে মনের কথা কইবার মতো একটি নিরাপদ স্থান নেই; পিতামাতা, আত্মীয়স্বজনদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই; উপরন্তু গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো দুটি বিচ্ছুর অনন্ত অত্যাচার তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো ।

সবচেয়ে ঝুট–ঝামেলা হয় বিচ্ছুগুলির চোখে ধুলো দিয়ে একটি পছন্দসই স্থান নির্ধারণ করণে । প্রথম কয়েকদিন তারা রমনা পার্ক থেকে শুরু করে আর্টস লাইব্রেরির প্রাঙ্গণে দেখা সাক্ষাৎ করেছে, কিন্তু প্রতিবারই অকালপক্ক শয়তানের দলটি সাইলেন্সার পাইপ বিহীন দুটি মটর সাইকেলে সওয়ার হয়ে চড়াও হয়েছে । এই একটি ব্যাপারে তাদের কোন ক্লান্তি এবং অপরাগতা নেই । বর্তমান পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে মটর সাইকেলের শব্দেই উষার এলার্জি দেখা দেয় ।

অবশেষে প্রচুর বুদ্ধিমত্তা ফলিয়ে মোর্শেদ একটি নিশ্চিত পরিকল্পনা তৈরি করেছে । সেটি এই রকম, সে মাঝে মাঝেই জয়দেবপুর যাবার বাহানা করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়বে এবং রাসেলদের চোখে ধুলো দেবার জন্য নির্দিষ্ট পথ ধরেই

এগোবে। যখন বুঝবে তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে না তখন ফিরে এসে ইউনিভার্সিটি থেকে উষাকে তুলে নিবে এবং মীরপুর চিড়িয়াখানা অথবা বোটানিক্যাল গার্ডেনের অপূর্ব নৈসর্গিক পরিবেশে দুজনার নিভৃত প্রেমালাপ চলবে। উষা রোমাঞ্চিত বোধ করছে, যে মিলনে বাধা নেই তা নিতান্তই নীরস উত্তেজনাহীন।

প্রথম দিনেই মোর্শেদের কৌশলটি চমৎকার উতরে গেলো। উষার মুখে হাসি ফুটলো।
–বাঁচা গেছে বাবা। বেয়াদপগুলোর জ্বালায় মান–ইজ্জত বলে আর কিছু থাকছিলো না।
–ওরা যদি টের পায় তাহলে আমার মাথা কাঁচা চিবিয়ে খাবে।
–টের পেলেই হলো! অবশ্য তুমি নিজে যদি ফাঁস না করো। তোমার পেটে তো কিছু থাকে না।
–ওদের খপ্পরে তো পড়নি। এমনভাবে জেরা করতে শুরু করে যে বাপ বাপ বলে সব ফাঁস্ করে দিতে হয়।
চিড়িয়াখানায় ঢুকে উষাকে নতুন একটি বিপদের সম্মুখীন হতে হলো। বাঁদর এবং হনুমানেরা মোর্শেদের এতখানি প্রিয় তা সে ঘুনাক্ষরেও ভাবেনি। দেখা গেলো মোর্শেদকে এই খাঁচাগুলি থেকে নড়ানই দুঃসাধ্য, উপরন্তু সে ছটাক ছটাক বাদাম কিনে উদার হস্তে বিলি বন্টন করতে শুরু করলো! উষার কান্না পাচ্ছে।
–এই গাধা, তুমি বাঁদর দেখতে এসেছো নাকি?
–আহ্ হা, এতো রাগছো কেন? ব্যাটাদের ইতরামীগুলো একটু দেখইনা। –দেখো দেখো ঐ বান্দরটা কেমন পিট পিট করে চোখ টিপছে। হাঃ হাঃ হাঃ শালার বান্দরের মধ্যেও এই রীতিটা চালু আছে জানতাম না তো!
–বাঁদররা কি করে না করে তা দিয়ে তোমার কি? তুমি কি বাঁদর?
–হাঃ হাঃ হাঃ এই ব্যাটা আবার আমার দিকে তাকিয়ে কেমন ভেঙ্গচি কাটছে দেখছো। এক থাপ্পড়ে তোর বত্রিশ গুষ্টির নাম ভুলিয়ে দেবো। ব্যাটা বেলিক, ফাজলামী করার জায়গা পাস না?

উষা ক্ষ্যাপাটে গলায় বললো, মোর্শেদ, আমি লেকের পাশে গিয়ে বসছি। মিনিট পাঁচেক থাকবো।
তাকে গট্ গট্ করে রওনা হতে দেখে মোর্শেদ দ্রুত পায়ে পিছু নিলো। –ইস্ দারুণ একটা জিনিস মিস করলে তুমি। একটা পিচ্চি বান্দর দিব্যি দুখানা কলা দেখিয়ে দিলো আমাকে। না দেখলে বিশ্বাস করা যায়।
–আরেকবার বাঁদরের নাম করেছো তো এটাই আমাদের শেষ দেখা।
–এটা কোন কথা হলো? বান্দর আর তুমি এক হলে? জানো ছোটবেলায় আমার একজোড়া ...
–আবার?
মোর্শেদ আধ হাত জিব বের করে কান মললো, আর বলবো না।
খালের পাশে একটি নির্জন স্থান বাছাই করলো উষা। দুজনে ঘনিষ্ট হয়ে বসলো। মোর্শেদ উষার একখানি নিটোল বাহু অধিকার করলো, উষা আপত্তি জানালো না। আজকাল মোর্শেদ তার শরীরের উপর যথেষ্ট আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছে। ব্যাপারটি উপভোগ্য হলেও ঠিক কতদূর অগ্রসর হওয়া নৈতিকতা বিরুদ্ধ নয় তা সে বুঝতে পারছে না।
–বেশ জায়গা, তাই না?
–হাঁ।
মোর্শেদকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি তেমন মনোযোগী মনে হয় না। সে উষার হাতে আলতো করে চুম্বন করে।
উষা হেসে ফেলে। –তোমার কি হয়েছে বলো তো? আজকাল যখন তখন আমার হাতে চুম খাও কেন?
–তোমাকে আরো গভীরভাবে অনুভব করার চেষ্টা করি।
–খুব ফাজিল হয়েছো, তাই না?
–এর মধ্যে ফাজলামীর কি দেখলে?
–থাক, আর ন্যাকামী করতে হবে না। ভেবেছো আমি কিছু বুঝি না?
–কি বুঝেছো, শুনি।
–যা সত্যি, তাই বুঝেছি।
–শুনিই না।
–তুমি আজকাল আমার সাথে শুধুমাত্র কথাবার্তা বলে কোন মজা পাচ্ছ না। অন্য কিছু চাইছো।
–কি চাইছ?

মোর্শেদের ঠোঁটে দুষ্টমীর ঝিলিক দেখা দেয়। উষা চোখ মটকায়। –নির্লজ্জ কোথাকার। জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করছে না?
–হাঃ হাঃ আমার লজ্জা টজ্জা থাকলে তো।
–তাই বুঝি? প্রথম দিকে তো লজ্জায় মুখে রা সরতো না।
–তখন তো তুমি এতো কাছের মানুষ ছিলে না।
উষার ঠোঁটেও দুষ্টমীর ছোঁয়া লাগে। –সত্যি করে বলতো তুমি কি চাও?
–জানলে তো বলবো।
–জানো না?
–উহু।
উষা হাত বাড়িয়ে মোর্শেদের কান ধরলো। –আমাকে চুমু খেতে ইচ্ছে করে, না?
–হু, করে।
–এখনও করছে?
–হ–উ–উ।
–খবরদার, তেমন কিছু করার চেষ্টা করলে পিটিয়ে ছাতু বানিয়ে ফেলবো।
মোর্শেদ আরো ঘনিষ্ট হয়ে এলো। শাস্তিটা এমন কিছু বিপদজনক মনে হচ্ছে না।
–এই খবর্রদার।
–পিজ একটা।
–অর্ধেকটাও না।
–একটা! পিজ উষা।
অনুমতির অপেক্ষা করে না মোর্শেদ, উষাকে জড়িয়ে ধরে অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে চুমু খেতে গিয়ে নাকে ধাক্কা খায়।
–এই ছাগল, নাকটা ভেঙ্গে ফেলবে তো।
–সরি, ভুল হয়ে গেছে।
দ্বিতীয়বারে প্রচেষ্টা সার্থক হয়। কোমল স্পর্শকাতর ওষ্ঠদ্বয়ের পারস্পরিক সম্মিলিত সুতীব্র আনন্দের স্ফুরন ঘটায়, এবং বেশ কয়েকটি আবিষ্ট মুহূর্তের সৃষ্টি করে, দুটি প্রেমমদির হৃদয় এক অপূর্ব অনুভুতিতে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

উষা ধাক্কা মেরে মোর্শেদকে সরিয়ে দেয়। –শয়তান কোথাকার।
মোর্শেদ সলাজ ভঙ্গিতে হাসতে থাকে। –বিশ্বাস করো, এই প্রথম।
–সে আর বলতে হবে না। নাকটা এখনও ব্যথা করছে।
–সরি। ম্যাসেজ করে দেবো?
–জ্বি না, তার দরকার নাই।
–তুমি কি রাগ করলে উষা?
মোর্শেদের নিরীহতা দেখে উষাকে হাসতেই হয়। –এই মতলবেই কি এখানে এসেছিলে?
–ধ্যাৎ মোটেই তা না। কিন্তু তোমাকে এতো সুন্দর লাগছে, যে ...
–যে?
–তোমাকে নিয়ে কি করবো বুঝতে পারছি না।
উষা খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। –পাগল কোথাকার।
কয়েকদিন ধরেই মোর্শেদের মনে একটি কথা ঘুরপাক খাচ্ছে, উষাকে বলা উচিৎ হবে কিনা বুঝতে পারে নি। এই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেয়াটা তার কাছে বেশ সহজসাধ্য মনে হলো।
–উষা, চলনা আমরা বিয়ে করে ফেলি।
–বিয়ে! এতো তাড়াতাড়ি?
–তাড়াতাড়ি কোথায়? আমাদের দুজনারইতো যথেষ্ট বয়স হয়েছে।
–আমার বাবা মা কিছুতেই রাজী হবেন না। অনার্সের আগে কোন মতেই আমাকে বিয়ে দেবেন না তারা।
–আমি কথা দিচ্ছি বিয়ের পর তোমার পড়াশুনার কোন ক্ষতি হবে না।

উষা মিটমিটিয়ে হাসতে লাগলো। –এতো ব্যস্ত হবার কি আছে? নাকি আর তর সইছে না?
–মানে?
–ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানো না, ন্যাকা। পারলে তো একখনই আমার বারোটা বাজাও।
–আরে বাবা বারোটা বাজাতে চাই না বলেইতো বিয়ে করতে চাচ্ছি।
–বাবাকে গিয়ে বলো। জুতো পেটা করবে।
মোর্শেদের মন খারাপ হয়ে গেলো। অস্বীকার করার উপায় নেই, সে ইদানিং উষার প্রতি প্রচণ্ড রকম দৈহিক আকর্ষণ অনুভব করছে। এই প্রবল যৌনানুভূতিকে অবহেলা করা দুঃসাধ্য।
–কি ব্যাপার, সাহেবের মন খারাপ হয়ে গেলো নাকি?
উষা মিথ্যে বলবো না, আজকাল সত্যি সত্যিই আমার খুব অস্বস্তি লাগে রাতে ভালো ঘুম হয় না।
–তাই, আমাকে কি করতে হবে?
–মাঝে মাঝে একটু আধটু উদার হলেই চলবে।
উষা একখানি লাজুক হাসি উপহার দিলো। –ফের কখনো এমন কিছু করলে ঠোঁট কামড়ে দেবো।
এই মিষ্টি হুশিয়ারী মোর্শেদকেও প্রচণ্ড সাহসী করে তুললো এবং সে তৎক্ষণাৎ উষাকে একটি কড়া চুম্বন করলো। তার ঠোঁট কামড়িয়ে দেয়া হলো না।
একটি সিঁড়ি টপকে গেলে অন্যান্য সিঁড়িগুলি উতরে যাওয়াও আর পূর্বের মতো দুরূহ মনে হয় না। উষা এবং মোর্শেদের পরিণতি তেমন একটি অবস্থায় দাঁড়ালো। ইদানিং শুধু ঠোট নয় মোর্শেদের হাতও কথা বলতে শুরু করেছে। উষার কখনো ভালো লাগে, কখনো দ্বিধা হয়, সে বড় অস্থিরতায় ভুগছে।
আজ রাতে মোর্শেদের ফোন করার কথা রয়েছে। উষা অনেক কৌশল খাটিয়ে টেলিফোন সেটটিকে নিজের ঘরে নিয়ে এসেছে। টেলিফোনে মোর্শেদের কণ্ঠস্বর যথেষ্ট উত্তেজিত এবং আবেগ ঘন শোনালো।

–উষা, কাল রাতে আমার এক ফোঁটা ঘুম হয়নি।
–ঘুম না হলে ঘুমের বড়ি খাবে। আমাকে বলছো কেন?
–উষা, আমি তোমাকে ভালোবাসি।
–বুঝলাম, এবার আসল কথাটা বলে ফেলো।
–উষা, আমাকে তুমি বিশ্বাস করো না?
–এক থাপ্পড় দেবো। কি বলতে চাও তাই বলো।
–উষা, আমি তোমাকে অনেক আপন করে পেতে চাই।
–পাচ্ছোই তো।
–না, আরো আপন করে, আরো গভীরভাবে।
–পিজ মোর্শেদ, ছেলেমানুষী করো না।
–আমি তোমার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেই?
–খবরদার না। বাবা তোমাকে নির্ঘাত অপমান করবেন।
–তাহলে কি হবে?
–কেন, যেভাবে চলছে সেভাবেই চলবে। আমার অনার্স পরীক্ষা হয়ে গেলে তখন বাবা–মাকে বলা যাবে।
–ততোদিন আমি বাঁচবো না, উষা ...
–উষা, হোটেল সুরভীতে কাল সারাদিনের জন্য একটা কামরা ভাড়া নিয়েছি। তুমি আসবে, পিজ?
–না।
–পিজ!
–না।
–তুমি আমার কষ্ট বুঝলে না।
–অসভ্য কোথাকার। এমন একটা কু–প্রস্তাব দিতে তোমার বাধলো না?
–যাকে ভালবাসি তাকে সম্পূর্ণভাবে পেতে চাওয়াটা বুঝি অপরাধ?

–অতসব বুঝি না। এটা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি না?
–উষা, সত্যিই তুমি আসবে না?
–না।
উষা লাইন কেটে দেয়। তার হৃদয়ে আশৈশব নৈতিকতাবোধ তীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। বিপরীত যুক্তিরও অভাব হয় না। যাকে ভালোবাসা যায়, তার সাথে দৈহিক মিলনে অন্যায় কোথায়? উষার সমস্ত হৃদয় বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায়। মোর্শেদ তাকে একি যন্ত্রনার আবর্তে ফেলে দিয়েছে?

মোর্শেদ দাঁড়িয়ে ছিলো হোটেল সুরভীর লবীতে। তার দৃষ্টিতে গভীর আত্মমগ্নতা।
–উষা!
–এতো অবাক হচ্ছো কেন? তুমিতো আমাকে আসতে বলেছিলে, বলনি?
–উষা, কাল রাতের কথাবার্তার জন্য আমি খুব দুঃখিত। তখন আমার মাথা ঠিক ছিলো না। কি বলতে কি বলেছি খেয়াল নেই। সকালে উঠেই তোমাকে ফোন করতে পারতাম, সাহস হল না। পিজ, তুমি কিছু মনে করো না।
উষা খুব সেজেছে, তার যৌবনচ্ছল শরীরখানি নব উন্মাদনায় কলোল্লিত হয়ে উঠেছে, সে একটি অসাধারণ মদির কটাক্ষ হাসলো। –র ম নাম্বার কত?
–মানে।
–গাধার মতো কথা বলো না।
–উষা।
তারা হাতে হাত রেখে সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠে যায় এবং দ্রু ত এগিয়ে যেতে থাকে সেই অনিবার্য পরিণতির দিকে যখন তাদের হৃদয় এবং দেহ, চেতনা এবং অনুভূতি একটি মাত্র সুললিত ধ্বনিতে বিলিন হবে এবং বিন্দু বিন্দু ঘাম, রাশি রাশি উত্তেজনা, চমকিত শিৎকার ও আনন্দময় জীবনের একটি নব্য স্বরূপকে আবিস্কার করবে।

পাঁচ

দলটি নিউমার্কেটে ঢুকেই একটি হৈ চৈ বাঁধিয়ে তুললো। ছটি বখাটে ছেলে প্রতিটি মেয়েকে লক্ষ্য করে সরস মন্তব্য ছুঁড়তে শুরু করলো। তাদের রসিক হৃদয় বৃদ্ধা দাদি–নানিকে দেখেও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। ফল নিতান্ত শুভ হলো না, পাঁচ মিনিটের মাথায় কঠিন হুজুত পাঁকিয়ে গেলো। বাধ্য হয়ে মোর্শেদ এবং উষাকে নাক গলাতে হল।

–বাদ দিন, বাদ দিন, এগুলো এক একটা আস্ত পাগল। পাগলের সাথে কি পাগলামি করলে চলে?

বিশালদেহী যুবকটি রক্তচক্ষু মেলে মোর্শেদের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো। –জানেন এরা আমার বোনকে কি বলেছে? শুনতে চান? এই নীপা, বলতো তোকে এরা কি বলেছে?

–থাক না ভাইয়া, এসব নিয়ে খামোখা ঝামেলা করার কি দরকার?

–খামোকা মানে? এই শয়তানগুলোর জন্য মেয়েরা আজকাল রাস্তা ঘাটে পর্যন্ত বের হতে পারে না। পিটিয়ে এগুলোর হাড় মাংস এক করে দেয়া দরকার।

রাসেল গর্জে উঠলো, আচ্ছা, আমরা শয়তান আর আপনি ধোয়া তুলসী পাতা। নাক টিপলে দুধ বের হয়। সুযোগ পেলে তো দুবগলে দুটোকে চেপে ধরে ড্যাং–ড্যাং করে নাচতেন, আবার বড় বড় বাত চিৎ করা হচ্ছে। পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ফেলবো। হোয়াট?

মোর্শেদ কড়া ধমক লাগালো। –এই রাসেল, থামবে তুমি?

–কেন থামবো। একটু আগেই দেখলাম ও ব্যাটা ড্যাব ড্যাব করে একটা ম্যারিড মহিলার দিকে তাকিয়ে আছে। এখন আবার দিব্যি উলটো ঝাড়ি মারছে। ঠ্যাং ভেঙ্গে গাব গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখবো। ঘুঘু দেখেছো ফাঁদ দেখেনি।

কিশোর মেয়েটি ফাঁদ দেখানোর প্রস্তাবে বিশেষ শংকিত হয়ে পড়লো। সে কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, ভাইয়া চলো, আমার এসব ভালো লাগছে না।

–চুপ কর তুই। এই হারামী ছোড়াটাকে একটু ধোলাই দেয়া দরকার।

–আরে যা যা, তোর মতো কতো মস্তান ঠ্যাংঙের তল দিয়ে এলো আর গেলো।

বিশালদেহী যুবকটি ক্রোধে ফুঁসছিলো, সে এবার বেপরোয়া ভঙ্গিতে তেড়ে এলো। রাসেলকে যুবকটির পাশে ছইঞ্চি লিলিপুটের মতো দেখালেও তার সাহসের অভাব নেই, সেও দুহাতে দুই ঘুষি পাকিয়ে সদম্ভে আস্ফালন করতে লাগলো, আয়, হয়ে যাক এক হাত।

মোর্শেদকে বাধ্য হয়েই তৎপর হতে হয়। সে একটি তীক্ষ্ণ কিয়াই চীৎকার দিয়ে দর্শনীয় কারাটে ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে যায়।

–খবরদার, আর এক পা এগুলেই পিটিয়ে লাশ বানিয়ে ফেলবো।

যুবকটি প্রচণ্ড বিস্ময় নিয়ে বললো, আপনিও এই বদমায়েশ ছোড়াগুলোর পক্ষ নিচ্ছেন?

–আমি তো আপনাকে বলেছিই এগুলোর মাথায় গোলমাল আছে ওদের হয়ে আমি মাফ চেয়ে নিচ্ছি।

–কি যা তা বলছেন মোর্শেদ ভাই? আমাদের মাথায় কোন গোলমাল নেই। সমস্বরে আপত্তি উঠে।

উষা কষে ধমক লাগায়। –এক থাপ্পড়ে বত্রিশ দাঁত ফেলে দেবো, বেয়াদবের দল। মুখে তালা ঝুলিয়ে রাখো।

ব্যাপারটি অল্পতে মিটে যায়। রাসেল উলসিত কণ্ঠে বলতে লাগলো, ব্যাটাছেলে ভয়ে কেঁচো মেরে গেছে। মোর্শেদ ভাই আপনি যা একখানা একশন নিয়েছিলেন না, স্বয়ং ব্রু সলী পর্যন্ত ভিমড়ী খেতো।

–কথাবার্তা একটু কম বলো রাসেল। আমার এখন তোমাকেই পিটিয়ে তুলোধুনো করতে ইচ্ছে করছে।

রাসেল উষার আড়ালে গা ঢাকা দিলো। –যতো বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

উষা তার কান টেনে লাল করে দিলো।

রাজিয়া বেগম এসেছিলেনে একটি নতুন অলংকার সেটের অর্ডার দিতে, তিনি ফার্ব ক জুয়েলার্সের সামনে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করলেন, তার চক্ষু ছানাবড়া হয়ে উঠলো। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন তার অতি আদরের মেয়েটি একটা অসভ্য, বজ্জাতের খপ্পরে পড়েছে, তাকে এখনিই উদ্ধার করা প্রয়োজন। তিনি বড় বড় পদক্ষেপে এগিয়ে যান।

মাকে দেখে উষা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে, তার শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে উঠে। –মা। তুমি এখানে?

আমারও একই প্রশ্ন। –তুই এখানে?

–মা, তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেই ...

–কোন দরকার নেই।

রণক নিস্পাপ কণ্ঠে জানতে চাইলে, উষা আপা, আপনার আম্মা বুঝি?
–হ্যাঁ।
–আস্সালামু আলাইকুম খালাম্মা। উষা আপার মুখে আপনার কথা আমরা কতো যে শুনেছি?
–ওর মুখে তো আপনার প্রশংসা ছাড়া অন্য কোন কথাই নেই। এরকম মা পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার। মজনু মিষ্টি হেসে যোগ করলো।
কাজটি উচিত হয়নি, কারণ ধমকটি তাকেই খেতে হলো।
–চুপ্। আমি তোমার সাথে কথা বলছি না। উষা, আমি বাসায় যাচ্ছি, তুই কি আমার সাথে যাবি?
উষা অসুস্থ বোধ করতে শুরু করলো। সন্দেহ নেই মা তার জীবনটাকে নরক বানিয়ে ছাড়বে। একেই বলে কপাল, পড়বি তো পড় মালির ঘাড়ে।
রণক বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললো, আমরা রেষ্টুরেন্টে যাচ্ছিলাম। আপনিও আসুন না খালাম্মা, পিজ। আমরা খুব খুশী হতাম।
রাজিয়া কড়া দৃষ্টিতে তাকে পরখ করলেন। –এই ছেলে, তোমার নাম কি? জ্বি, আমাকে বলছেন?
–হ্যাঁ।
–রণক চক্রবর্তি।
–থাকো কোথায়?
–জ্বি, মালিবাগে।
ভবিষ্যতে আর কখনো আমার সামনে পড়ো না, চড়িয়ে তোমার গাল ভেঙে দেবো।
রণক ততোধিক বিগলিত হয়ে পড়লো। –আপনি গুরু জন, আপনার হাতে চড় খাওয়াও পুণ্যি।
রাজিয়ার ইচ্ছে হলো এই ছেলেটিকে তিনি গুলি করে মারেন, এই টুকুন ছেলে অথচ কেমন কৌশল খাটিয়ে ইয়ার্কি মারছে।
–উষা, তুই আমার সাথে চল। তোর সাথে আমার কিছু কথা আছে।
তিনি উষাকে পাকড়াও করে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মোর্শেদের চোখে মুখে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।
–সব শেষ হয়ে গেলো, রাসেল। আর বেঁচে থেকে কি লাভ?
–বললেই হলো? ঐ মহিলার বাপের সাধ্যি আছে উষা আপাকে আটকিয়ে রাখে?
–না, তা নেই। তবে উষার বাবার কথা আলাদা। মোর্শেদ বুক ফাটা দীর্ঘশ্বাস ছাঁড়ে।
রণক দাঁতে দাঁত ঘষলো। –কি উড়নচণ্ডী মহিলারে বাবা। বাপের জন্মে এমনটি দেখিনি।
–ছিঃ ছিঃ, ওভাবে বলতে নেই রণক। হাজার হোক ...
মজনু বললো, তেমন কোন আশা আছে বলে তো মনে হচ্ছে না, মোর্শেদ ভাই। অবশ্য না থাকাটাই ভালো। অমন শাশুড়ী কপালে জুটলে জীবনটাই বরবাদ।
মোর্শেদ আরেকটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একটি সিগারেট ধরায়। সে একটি বড় রকমের ঝুট ঝামেলার ইঙ্গিত পাচ্ছে। তার কানে এলো, সাব্বির ভরাট গলায় একটি বিরহের গান গাইতে শুরু করেছে ... আজ দুজনার দুটি পথ ওগো দুটি দিকে ... ইত্যাদি ইত্যাদি। তার চিত্ত ব্যথাতুর হয়ে উঠলো, এই ছেলেগুলির হৃদয় বলে কিছু নেই, তারা এমন একটি গুরু তর বিষয় নিয়েও অম্লানবদনে ঠাট্টা মশকরা করতে পারে।

রাজিয়া বেগম নিজে প্রেম করে বিয়ে করেননি, প্রেমের ব্যাপারে তার বিশেষ রকম স্পর্শকাতরতা রয়েছে। ছেলেবেলায় একটি সুদর্শন ছেলেকে প্রেম নিবেদন করে তিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন এবং তিনটি ঘুমের বড়ি খেয়ে পৃথিবীকে শেষ বিদায় জানিয়েছিলেন। দীর্ঘ বারো ঘন্টা পরে যখন ঘুম ভাঙলো, তখন থেকেই দুঅক্ষরের শব্দটির প্রতি তার তীব্র বিতৃষ্ণা।

সেই রাতে উষার বাবাকে সম্পূর্ণ ঘটনাটি তিনি অত্যন্ত ফলাও করে বর্ণনা করলেন। সিদ্দিক সাহেবের বুঝতে বাকী রইল না, তার মেয়ে একদল উদ্ভট পোশাকধারী, কানে দুল পরিহিত পাঙ্ক ছেলের পালায় পড়েছিলো, এবং তার স্ত্রীর অফুরন্ত সাহস ও বিচক্ষণতাই মেয়েটিকে এই যাত্রা রক্ষা করেছে। তিনি গম্ভীর মুখে হুকুম নামা জারি করলেন। –ওকে একদম বাসার বাইরে যেতে দেবে না।
–কিন্তু ভার্সিটি?

–রাখো তোমার ভার্সিটি। যত্তোসব পাগল ছাগলের জায়গা। ওর আর পড়াশুনার দরকার নেই। আমি পাত্র দেখছি। দুমাসের মধ্যে বিয়ে দিয়ে দেবো।
–সেই ভালো। ছেলেগুলোকে আমার সুবিধার মনে হলো না। বিশেষ করে কালো মতন একটা লম্বা ছেলেকে, উষার হাত ধরে হাঁটছিলো অসভ্যটা।
–বল কি? পানি এতদুর গড়িয়েছে। ছেলেটাকে চিনতে পারলে?
–উহু। তবে বাসার সামনে কয়েকদিন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। দেখলেই গুণ্ডা বদমায়েশ মনে হয়।
–চেহারাটা কেমন?
–গুণ্ডা বদমায়েশ যেমন হয়।
–আচ্ছা। তাহলেতো পুলিশে খবর দিতে হয়।
–না না, ওসব পুলিশী ঝামেলায় যাবার দরকার নেই। মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে দিলেই সমস্যা চুকে যায়। ছেলে দেখো।
–তাতো দেখবই। তুমি কিন্তু সতর্ক থাকবে, ছেলেগুলোকে বাড়ির আশে পাশে দেখলেই আমাকে জানাবে।
–সেটা আর আমাকে বলে দিতে হবে না। তুমি এখন উষাকে ডেকে ভালো করে বলে দাও ও যেন বাসা থেকে বের না হয়।
–নিশ্চয়, নিশ্চয়। ডাকো ওকে।
উষা নতমুখে বাবার সামনে হাজিরা দেয়। ভয়ে তার গলা শুকিয়ে উঠেছে। হৃদয়হীন বলে তার বাবার যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে, প্রেমের মাধুর্য তিনি কি বুঝবেন?
–উষা, আমি চাই তুই তোর মায়ের অনুমতি না নিয়ে কোথাও যাবি না।
–ভার্সিটিতেও না?
–না।
–ঘরে বসে বসে কি করবো তাহলে
–ভি,সি,আর–এ হিন্দি ছবি দেখবি।
অভিমানে উষার কণ্ঠস্বর বুজে আসে। বাবা–মায়েরা সব সময় এতো অবুঝ হয় কেন?
–যা বললাম মনে থাকবে তো?
উষা বাবার কথায় কোন জবাব দেয় না, দৌড়ে নিজের ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দেয় এবং কান্নায় ভেঙে পড়ে।
একটি সপ্তাহের পরিপূর্ণ বিরহ মোর্শেদকে একেবারেই কাবু করে ফেলেছে। তার কাছে এখন সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের বিশেষ কোন অর্থ নেই, দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং অন্ন গ্রহণের আবশ্যকতাও নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। সে অধিকাংশ সময়ই শুয়ে বসে কাটায়। অফুরন্ত সিগারেট ফোঁকে এবং সম্ভব অসম্ভব নানা ধরণের কুটিল চক্রান্ত এঁটে উষাকে উদ্ধারের পরিকল্পনা করে। তাকে নিয়ে তাদের বাসায় বিশেষ রকম অশান্তি দেখা দিয়েছে, তার মা এবং ছোট বোন প্রায়শই নাকি সুরে কান্না কাটি করে।

রাসেলদের আড্ডাটি দোকান থেকে মোর্শেদের বাসায় উঠে এসেছে। ব্যাপারটি অবশ্য তাদের জন্য পোয়া বারো হয়েছে, কারণ মোর্শেদের কিশোরী বোন দুটি যথেষ্ট সুন্দরী এবং উদার। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই এই দুটি পক্ষের ভেতর চমৎকার হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে। অবশ্য মোর্শেদের মায়ের কথা পৃথক, তিনি পারতপক্ষে এই পাজীর পা ঝাড়া গুলিকে ঘরের দরজা মাড়াতে দিতেও রাজি নন।

সারাটি বিকাল ধরে প্রচুর জল্পনা কল্পনা চলেছে। বিশেষ কোন সুবিধা হয়নি। রাসেল দীর্ঘক্ষণ চিন্তাভাবনা করে বললো, এক কাজ করা না, উষার বাবা মার কাছে গিয়ে বুক ফুলিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে দিন।
–তোমার মাথা খারাপ? আমার বাবার সাথে ওর বাবার ফাটাফাটি সম্পর্ক। দারোয়ান দিয়ে স্রেফ ঘাড় ধাক্কিয়ে বের করে দেবে। এই বয়সে ঐ রকম একটা অপমান হজম করা খুব কঠিন হবে।
–এহ্ ঘাড় ধাক্কা দিলেই হলো? ব্যাটা দারোয়ানের চৌদ্দগুষ্ঠির ঘাড় থেকে গর্দান নামিয়ে ফেলবো না।
মুকিত এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলো, তার চোখে মুখে গভীর উদ্বেগের ছায়া। সে কাঁচুমাচু গলায় বললো, ইয়ে মোর্শেদ ভাই একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি।

এতো বিনয় করছো কেন ভাই, কি হয়েছে ঝটপট বলে ফেলো আমি এখন আর এই দুনিয়ার মানুষ নই, কোন দুঃসংবাদেই আমার কিছু হবে না।
–ইয়ে, উষা আপার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।
–কি।
–না মানে, একদম ঠিক হয়নি। আজ রাতে ছেলে পক্ষ মেয়ে দেখে পাকা কথা দিয়ে যাবে।
মোর্শেদ চুল ছিঁড়তে লাগলো। –আমার কি হবে মুকিত। আমি তো ওকে ছাঁড়া বাঁচবো না। ওর বিয়ে হয়ে গেলে আমি ঠিক আত্মহত্যা করে বসবো। কার জন্য এই জীবন? কিসের জন্য?
জাকের চিন্তিত স্বরে বললো, বিয়ে হযে গেলেই আত্মহত্যা করাটা ঠিক হবে না। কারণ উষা আপার এই স্বামীটা বছর খানেক পরে ফটাং করে মরেও তো যেতে পারে। তখন আপনি একটা দাঁও মারতে পারেন।
–তাকে একটা সম্মিলিত ধমক খেতে হলো।
মজনু বললো, এতো ভেঙে পড়বেন না, মোর্শেদ ভাই, ব্যবস্থা একটা হবেই।
–গত সাতদিন ধরে তো শুধু ব্যবস্থা–ব্যবস্থা করছো। কই এখন পর্যন্ত তো একটা ফুটো পয়সার বুদ্ধিও দিতে পারলে না।
সাব্বির অত্যন্ত জটিল বুদ্ধিমত্তার জন্য বিশেষ রকম বিখ্যাত। সে সহজ স্বরে বললো, একটা বুদ্ধি অবশ্য আছে।
মোর্শেদ তার গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। –কি বুদ্ধি?
–ধর ন, আমরা যদি ছেলে পক্ষকে কোন রকমে বোঝাতে পারি যে আপনার এবং উষা আপার মধ্যে নিদার ণ লদকা–লদকি ছিলো তাহলে ওরা নিজেরাই যেঁচে পড়ে বিয়েটা ভেঙে দেবে।
–তাই তো। এই বুদ্ধিটাতো আমার মাথায় আসেনি। কিন্তু কাজটা কিভাবে করা যায়? আমরা তো কেউ কাউকে একটা চিঠি পত্রও লিখিনি।
–ছবি–টবি তুলেছেন?
–নাহ্।
রাসেল বিরক্ত হলো? –তাহলে এতোদিন ধরে কি ল্যাজ ছিঁড়লেন?
–কি করবো, ছবি তোলার কথা তো কারো কখনো মনেই হয়নি।
–বেশ হয়েছে এবার ঠ্যালা বুঝুন।
মজনু বললো, উষা আপাকে কোন রকমে বাসা থেকে বের করতে পারলেই তো সমস্যা মিটে যায়। মোর্শেদ ভাইয়ের কোলের উপর বসিয়ে হাজার খানেক ছবি তুলে ফেলা যাবে।
–আহ্। কি যা তা বলো মজনু। তাছাড়া যতদুর মনে হচ্ছে উষাকে সম্ভবত বাসা থেকে বের হতেই দিচ্ছে না। সুতরাং এই সব প্ল্যান–ট্যান খাটবে না।
সাব্বির বললো, খুব খাটবে। উষা আপাকে সমস্ত কথা জানিয়ে একটা খবর পাঠাতে হবে। বাসা থেকে বের হবার দুচারটে বুদ্ধিও বাতলে দেয়া যায়, তবে সেগুলো খাটবে কিনা, বাইরে থেকে বলা সম্ভব নয়।
মুকিত মাথা নাড়লো। খবর টবর পাঠানো খুব কঠিন কাজ হবে রে। রাজিয়া চাচী খুব সাংঘাতিক ঘোড়েল, গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে পড়ে মাথাটা একদম বিগড়ে গেছে, ওনার কাছে কোন ট্রিকস খাটবে না।
–কেন খাটবে না? উষা আপার কাছে একটা চিঠি পাঠাবো বিদেশের ঠিকানা দিয়ে। গোয়েন্দা চাচী কিছুই টের পাবেন না।
বুদ্ধিটি চমৎকার। সকলের পছন্দ হলো। কিন্তু পরিকল্পনাটিকে যথেষ্ট মজবুত করার মতো সময় পাওয়া গেলো না, কারণ মোর্শেদের বোন দুটি, যাদের নাম লীনু বীনু, চা বিস্কুট নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। মুহূর্তের মধ্যে চঞ্চলমনা ছেলেগুলি মোর্শেদের সমস্যা বেমালুম ভুলে গিয়ে লীনু–বীনুর সাথে খোশগল্পে মত্ত হয়ে পড়লো। মোর্শেদ বিরক্ত হয়ে ঘর ছাড়লো, যে আছে যার তালে।
ছেলেপক্ষ এলো সন্ধ্যা আটটার সময়। ছেলে নিজে, তার বাবা–মা এবং বড় দুই বোন। তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ড্রয়িংরুমে বসানো হলো এবং উষাকে এক রকম জোরপূর্বক তাদের সামনে এনে হাজির করা হলো। উষার চোখ মুখ এখনও লাল হয়ে আছে, আজ সারাদিনে প্রচুর কান্নাকাটি করছে সে।

রাজিয়া হাসি মুখে পরিচয় করিয়ে দিলেন, এই আমার মেয়ে উষা। আর উষা ইনি হচ্ছেন মি. মাসুদ, তোকে আমরা এর কথাই বলেছিলাম।

উষার ভাব–ভঙ্গিতে পরিস্কার বোঝা গেলো মাসুদ অথবা মোখলেছ, কারো জন্যই তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। সে সুদৃশ্য গালিচাখানির উপর চোখ রেখে নিঃশব্দে বসে থাকলো।
মাসুদের অনুভুতি ভিন্ন, উষাকে দেখেই তার হৃদয়ে ড্রাম বাজতে শুরু করেছে। সে মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে মেয়েটির সর্বাঙ্গ লেহন করতে লাগলো। এমন একটি মেয়েকে জীবন সঙ্গিনী করতে পারলেই তবে বেঁচে থাকা সার্থক।
মাসুদের বাবা চুপচাপ ধরনের মানুষ। তিনি মুখের সামনে একটি খবরের কাগজ মেলে ধরে ইথিওপিয়ার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মা এবং বোনেরা স্বভাবতই মেয়েটির তীক্ষ্ণ রূপ দেখে ভুললেন না, গুণের খোঁজ নিতে লাগলেন।
–তুমি কোথায় পড়ছো মা?
উষার মধ্যে উত্তর দেবার কোন প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলো না। বাধ্য হয়ে রাজিয়াকেই হাল ধরতে হলো।
–ও তো ভার্সিটিতে পড়ে, ইংলিশে।
–ফাষ্ট ইয়ারে রেজাল্ট কেমন হয়েছে, মা?
–সেকেন্ড ক্লাশ পেয়েছে। জানেনইতো, ইংরেজী বাংলার ফাষ্ট ক্লাশ পায় না বললেই চলে। উষা পড়াশুনায় খুবই ভালো।
–বিয়ের পর কি পড়াশুনার ইচ্ছা আছে তোমার? মাসুদের বড় বোন গম্ভীর গলায় জানতে চাইলো।
–নিশ্চয়ই। পড়াশুনা একবার ছাড়লে আর ধরা যায় না উষার তো পড়া চালিয়ে যাবার খুবই ইচ্ছা।
মাসুদের বাবা অন্যমনস্কভাবে বললেন, ঠিকই বলেছেন। পড়াশুনা করছে এমন মেয়েদের বিয়ে দেয়াই উচিত নয়। তাদের জীবনটাই নষ্ট।
রাজিয়া অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। সন্দেহ নেই এই ভদ্রলোকটির মাথায় গোলমাল রয়েছে, তার ছেলেটির তেমন কোন সমস্যা নেই তো। এই ব্যাপারে ভালো মতন খোঁজ খবর করা প্রয়োজন।

মাসুদের মা চমৎকার মহিলা। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, ওর কথা বাদ দিন। ও একটু দার্শনিক ধরনের মানুষ। আচ্ছা মা, সত্যি করে একটা কথা বলো তো, আমাদেরকে তোমার পছন্দ হয়নি?
–কেন হবে না, নিশ্চয় হয়েছে। কি বলিস উষা?
উষা উঠে দাঁড়ালো। –দেখুন, আজকাল কোন মানুষকেই আমার পছন্দ হয় না। সবাইকে লেজবিশিষ্ট প্রাণী মনে হয়। সে সবাইকে বিস্মিত করে ড্রয়িংরুম ছেঁড়ে বেরিয়ে যায়।
রাজিয়া প্রচুর কষ্ট করে তার ফ্যাকাশে ঠোঁটের ডগায় এক টুকরো হাসি ঝুলিয়ে ফেললেন। বড্ডো রাগী মেয়ে, কবে কখন আমার সাথে একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে, তার জেরটা আপনাদের উপর দিয়ে টেনে নিলো, হিঃ হিঃ হিঃ আপনারা যেন আবার কিছু মনে করবেন না।
মাসুদ হাঃ হাঃ শব্দে প্রাণ খুলে হাসতে লাগলো, যেন এই ঘটনাটি কোন কমেডি ছবির দৃশ্য। তার মা এবং বোন দুটি হত বিহবল হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন।

একটা চিঠি লেখা হয়েছে। সেখানি এই রকম ...
প্রিয়তমাষু উষা,
আমার অফুরন্ড় ভালোবাসা নিও। আজ কতোদিন হলো আমাদের দেখা হয়নি, কথা হয়নি। আমি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছি। কিন্তু তুমি বেশি চিন্ড়া করো না। ব্যবস্থা একটা হবেই প্রেমের পথে এমনি হাজারো বাঁধা এসেই থাকে, তাতে মুষড়ে পড়ার কিছু নেই। আমি রাসেলের সহযোগীতায় একটি চমৎকার পরিকল্পনা এটেছি। সেটা এইরকম, তুমি এবং আমি ঘনিষ্ট ভঙ্গিতে কিছু ছবি তুলবো এবং সেই ছবি ছেলেপক্ষকে দেখিয়ে তাদের কান ভারী করে তুলবো। স্বভাতই বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। তখন তোমার বাবা–মার কাছে আমরা বিয়ের প্রস্ড়াব দেবো। আমার পরিবারের সবাই রাজী হয়েছে। তোমাকে যেভাবেই হোক ঘন্টা–খানেকের জন্য বাসা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমরা তোমার বান্ধবী লীমার সাথে যোগাযোগ করছি, সে দুতিনদিনের মধ্যেই তোমাদের বাসায় যাবে এবং বিশেষ অজুহাতে তোমাকে তাদের বাসায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। অবশ্য এই ব্যাপারে তোমার মতামত জানা প্রয়োজন। আজ রাতে আমরা মুকিতের বাসায় থাকবো। যদি দেখি তুমি একবার আলো নিভিয়েছো তাহলে বুঝবে না। দুবার নেভালে হ্যাঁ। পরিশেষে তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না, কারণ আমি তোমাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসি, তুমি ছাড়া ... ইত্যাদি।
ইতি তোমারই প্রেমে পাগলপারা,
মোর্শেদ

পাগলপারা শব্দটির প্রতি মোর্শেদের যথেষ্ট আপত্তি ছিলো, একেবারেই ছেলে মানুষী ব্যাপার, কিন্তু তার কথায় রাসেলরা কোনরকম কর্ণপাত করেনি। তাদের সামনে এখনও অজস্র ঝুট-ঝামেলা।

প্রথমে পত্রখানাকে একটি এয়ার মেইলে ভরে ফেলা হলো এবং রাসেলের ডাকটিকেটের খাতা থেকে দুটি ইংল্যাণ্ডের টিকিট সংগ্রহ করে সেটে দিয়ে তার উপর অস্পষ্টভাবে কয়েকটি সিল মেরে দেয়া হলো। একটি ঝামেলা চুকলো।
দ্বিতীয় ধাপটি অধিকতর সমস্যা সঙ্কুল। যেভাবেই হোক পত্রখানি হাতে হাতে উষাদের বাসায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা চাই। পোষ্টম্যানটি অনেকদিনের পুরানো লোক, সে সিদ্দিক সাহেবের বিশেষ পরিচিত, তাকে ভজানো যাবে বলে ভরসা পাওয়া গেলো না। সুতরাং বাধ্য হয়ে নতুন বুদ্ধি আটতে হলো। রণককে স্কাউটের খাঁকী পোশাক পরিয়ে পুরো দস্তুর পোষ্টম্যান বানিয়ে ফেলে তার হাতেই পত্রটি গুঁজে দেওয়া হলো। রণক দুপুরের প্রচণ্ড রোদ এবং ভবিষ্যতের আতংকে প্রচণ্ডরকম ঘামতে শুরু করলো। চশমাটি ঘামে পিছলে নাকের নগায় এসে আটকিয়ে থাকাতে তাকে শেয়াল পণ্ডিতের মত দেখাচ্ছে।
হ্যাঁরে রাসেল, ওরা যদি কিছু টের পেয়ে যায়? ধরে বেঁধে রাখবে না তো? শেষে পুলিশী ঝামেলায় না পড়ে যাই।

আরে অতো ঘাবড়াস নাতো। টের পেলেই হলো? আমরা আশেপাশে আছি না? বিপদ দেখলেই চিৎকার দিবি, ছুটে গিয়ে তোকে ছাড়িয়ে আনবো।
–দেখিস বাবা, আবার উল্টো ঘুরে কাটিস না। জীবন মরনের প্রশ্ন এটা।
সাব্বির বললো, 'চশমাটা খুলে ফেল, রণক। তোর পোশাকের সাথে ওটাকে ঠিক মানাচ্ছে না।
–বলিস কি? চশমা ছাড়া আমি তো কিছুই দেখি না। শেষে হয়তো অন্য বাড়িতে গিয়ে হাজির হবো।
–সে সব নিয়ে চিন্তা করিস না। আমি তোর পেছন পেছনই থাকবো, পথচারী।
–কিন্তু গোয়ন্দা চাচী তো আমাকে দেখেছেন। উনি যদি চিনে ফেলেন?
রাসেল বিতৃষ্ণ স্বরে বললো, আরে ছোহ্, অতো স্মৃতিশক্তি থাকলে উনি আর হাউস ওয়াইফ হয়ে থাকতেন না, নোবেল প্রাইজের জন্য তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে দিতেন। তুই নিশ্চিন্তে রওনা দে।
–দেখিস, বিপদের সময় তোরা যেন পালাস নে।
–আরে যাহ্, কার ভয়ে পালাবো।
রণককে গেটেই আটকিয়ে দেয়া হলো। দারোয়নটি মাঝ বয়সী, শক্ত সমর্থ শরীর। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রণকের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলালো।
–তুমি আবার কবে এলে? আগের লোকটা কোথায়?
ওর পোষ্টিং হয়ে গেছে। আমি নতুন লোক। রণক ঝুলি থেকে পত্রটি বের করে –এটাতো সিদ্দিক সাহেবের বাসা, তাই না।
–হ্যাঁ।
–মিস উষার চিঠি।
–উষা আপার চিঠি? তাহলে তো বেগম সাহেবের হাতে দিতে হয়।
–না না, বেগম সাহেবাকে দেবেন কেন? যার চিঠি তার হাতেই দেবেন।
–তা দেয়া যাবে না। বেগম সাহেবার কড়া হুকুম।
রণক অসহকায় বোধ করলো। এই ব্যাটাছেলের সাথে একটা লেন–দেনের ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? কিন্তু ব্যাপারটি শেষে কেঁচে যেতে পারে। হয় তো দারোয়ান ব্যাটা বিশ্বস্ততার পরকাষ্ঠা দেখাবে। সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি তার নিজের জন্য বিশেষ রকম আশঙ্কাজনক হয়ে উঠবে। সে এই অকারণ ঝুঁকির মধ্যে নাগ গলালো না।
সে রাতে মুকিতের বাসায় রাত তিনটা পর্যন্ত জেগে কাটালো রাসেলরা। উষার পক্ষ থেকে কোন সাড়া এলো না। সম্পূর্ণ প্যান মাঠে মারা গেলো।

ছয়

উষার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের একজন লীমা। সে প্রস্তাব শুনেই ককিয়ে উঠলো। ওরে বাবা খাণ্ডারনীর সামনে আমি মরে গেলেও যেতে পারবো না।
রনক বললো –আপনি তো আর মোর্শেদ ভাইয়ের হয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিতে যাচ্ছেন না। আপনার ভয়ের কি আছে?
–ভয়ের কি আছে মানে? ঐ মহিলাকে তুমি চেনো, জেরা করে আমার বাপ–দাদার নাড়ীর প্যাঁচ বের করে ফেলবে। না বাবা, আমি এসবে নেই।
মোর্শেদ কাকুতি মিনতি শুরু করলো –পিজ মিস লীমা, এমন অবুঝ হবেন না। এটা তো আর হাসি ঠাট্টার ব্যাপার নয়, দুটো ফুলের মতো জীবন নিয়ে কথা। এই মুহূর্তে আপনি আমাদের আশা ভরসা। আপনার উপরেই নির্ভর করছে একটি অমুল্য প্রেমের পরিণতি।
–তাই নাকি? কি অসুবিধায় ফেলবেন বলুন তো। উষার মাকে দেখলে এমনিতেই আমার ভয়–ভয় করে, তারপর আবার এই সমস্যা। বড় ঝামেলায় পড়া গেলো তো।
রাসেল রাগী গলায় বললো, ঝামেলাটা কোথায় দেখলেন শুনি? আপনি গিয়ে উষা আপার মায়ের সাথে আলাপ জমিয়ে চিঠিটার খোঁজ জেনে নিবেন প্রথম, তারপর সেটাকে খালাস করার ব্যবস্থা করবেন, ব্যাস। এতো জলের মতো সহজ ব্যাপার।
–এই ছেলে, এমন ধমকে কথা বলবে নাতো। আমার খুব রাগ হয়। আমি কিছু করতে পারবো না।
মোর্শেদ নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথা চুলকাতে লাগলো। ভাল বিপদ হলো তো। এ যে একেবারেই বেঁকে বসেছে।
সাব্বির বুদ্ধি দিলো, পা দুখানাই চেপে ধরুন না। পায়ের ব্যাপারে মেয়েরা খুব সেনসিটিভ।
–বলো কি? ব্যাপারটা ইতরামি হয়ে যাবে নাতো?
লীমা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। –খবরদার মোর্শেদ ভাই, আমার পায়ে–টায়ে হাত দেবেন না। তাহলে কিন্তু আমি খুব রেগে যাবো।
রণক চশমা মুছতে মুছতে বললো, তাহলে একটা শর্তে আসা যাক, আপনি চিঠিটা উদ্ধার করে উষা আপার হাতে পৌঁছে দিন, আমরা আপনার পায়ের কড়ে আঙ্গুলও ছোবো না।
–তোমরা তো ভারী শয়তান। এটা কোন শর্ত হলো? চিঠিটা উদ্ধার করে উষার হাতে পৌঁছে দিন বললেই বুঝি দেয়া যায়? এতে কতো সমস্যা আছে জানো? ওর মা যদি আমাকে একবার সন্দেহ করে বসেন তাহলে নির্ঘাত থানায় খবর দেবেন। ওনার এক মামাতো ভাই পুলিশে চাকরি করেন, বাবারে, কি চেহারা। দেখলেই কলজে শুকিয়ে যায়। আমাকে মাফ করে দাও তোমরা, আমি পারবো না।

মজনু বললো, আপনাকে পারতেই হবে এমন কথাতো আমরা বলিনি। অন্তত একটা চেষ্টা তো করুন। আর যদি চিঠিটা নাই পাওয়া যায়, তাহলে আপনি নিজেও তো উষার সাথে দেখা করে তাকে সবকিছু খুলে বলতে পারেন।
মোর্শেদ মুহূর্তের মধ্যে চোখ মুখ কাঁদো কাঁদো করে ফেললো –আপনার দোহাই লাগে লীমা, এই উপকারটুকু করুন। আপনার কথা আমি কোন দিন ভুলবো না। পিজ।
আপনি এমনভাবে বলছেন, আমি তো না–ও–করতে পারছি না। আচ্ছা সমস্যায় পড়া গেলো। কি করি বলুন তো?
–রাজী হয়ে যান, পিজ। আপনাকে আমি রোজ চাইনীজ খাওয়াবো।
–ধ্যাৎ, চাইনীজ কি ডাল–ভাত যে রোজ রোজ খাবো?
–ঠিক আছে, আপনি যখন খেতে চান তখনই খাওয়াব।
লীমা হেসে ফেললো। –কি লোভই যে দেখালেন এখনতো রাজী না হয়েও উপায় নেই।
রাসেল বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়লো, লীমা আপা জিন্দাবাদ।
লীমা কানে আঙ্গুল দিলো, এই আস্তে আস্তে। আমার কানে তালা লেগে যাবে তো।
মোর্শেদ সোৎসাহে বললো, কখন যাচ্ছেন? আজই ...
–উহু। মনে মনে তৈরি হতে খানিকটা সময় লাগবে না?
–কাল সকালে যাবো।
জাকের প্রস্তাব দিলো, তাহলে প্রথম দফার চাইনীজটা আজ রাতেই হয়ে যাক, কি বলেন লীমা আপা?
–বেশ তো, হোক না। তোমরা সবাই যাবে তো?

তারা দাঁত বের করে হাসতে লাগলো। তা আর বলতে। মোর্শেদের গলা শুকিয়ে এলো। এই ছেলেগুলি এক একটি রাক্ষস বিশেষ, রেষ্টুরেন্টটি পর্যন্ত উদরে চালান করে দেয়াটা এদের জন্য নিতান্ত অসম্ভব কিছু বলে মনে হয় না। অনেকগুলি টাকার মামলা। সে মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। টাকা পয়সা কিছু নয়, প্রেম ভালোবাসাই বড় কথা। উষার জন্য সে সবকিছু করতে পারে।

লীমা বললো, কি মোর্শেদ ভাই, রাজী তো?

–নিশ্চয়, নিশ্চয়।

সাঈদ দরজা খুলেই একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হতবিহ্বল হয়ে পড়লো। –কাকে চান?

–উষা আছে?

–আছে। আপনি?

–আমি ওর বান্ধবী, লীমা। ভেতরে আসতে পারি?

–অবশ্যই, অবশ্যই।

লীমা ড্রয়িংরুমে ঢুকে একটি সোফায় বসলো। এই ছেলেটিকে সে আগে কখনও দেখেনি, তবে বুঝতে পারলো এটি উষার বড় ভাই সাঈদ, সিলেট মেডিকেল কলেজে ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। উষা প্রায়ই তার ভাইয়ের নানান খামখেয়ালীপনার গল্প শুনিয়ে থাকে।

উষাকে একটু ডেকে দেবেন, পিজ?

–নিশ্চয়। সাঈদের মধ্যে অবশ্য নড়াচড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেলো না। –আপনার কথা উষা আমাকে অনেক বলেছে। আপনি সুন্দরী সেটা অবশ্য ওর মুখে শুনেছিলাম। কিন্তু এতোটা সুন্দরী ...

লীমা লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। দেখা যাচ্ছে উষার শুধু একটি মেজাজী মা–ই নেই, একটি সৌন্দর্য পিপাসু ভাইও রয়েছে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। সে ঘামতে শুরু করলো।

–উষাকে যদি একটু ডেকে দিতেন? ওর সাথে আমার কিছু কথা আছে।

–আপনার কণ্ঠস্বরটি কিন্তু ভারী মিষ্টি। ও হ্যাঁ, আপনি বোধ হয় আমাকে চিনতে পারেন নি, আমি সাইদুর রহমান। উষার বড় ভাই, সিলেট মে ...

–জ্বি জানি। উষা আমাকে বলেছে।

সাঈদের মুখ দীপ্তিময় হয়ে উঠলো। –সত্যি বলেছে।

–জ্বি।

–আর কি কি বলেছে?

–আর কি বলবে?

–না মানে, আমার সম্বন্ধে আর কিছুই বলেনি?

–হ্যাঁ বলেছে, আপনি নাকি একবার এক নেড়ী কুত্তার তাড়া খেয়ে ইউক্যালিপটাস গাছে চড়ে বসেছিলেন। পরে উষা গিয়ে আপনাকে উদ্ধার করে।

–ছিঃ ছিঃ উষাটার কেমন আক্কেল দেখুন দেখি, এটা কি একটা বলার মতো ঘটনা হলো। কেন, সেবার যখন ওকে দেখে রাস্তায় দুটো ছেলে শিষ দিয়েছিল, তখন সেই দুই ছোটলোকের বাচ্চাকে আমি পিটিয়ে শায়েস্তা করিনি? বুঝলেন, মেয়েদের এই এক দোষ, সবসময় ছেলেদের খারাপ দিকগুলো খুঁচিয়ে বেড়ায়।

–না না, আমি কিন্তু আপনাকে খোঁচানোর জন্য কিছু বলিনি।

–সে আমি জানি, আপনার তেমন স্বভাবই নয়।

লীমা স্পষ্ট বুঝতে পারলো, এই ছেলেটি তার হৃদয় সরোবরে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এখনই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সে তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হয়ে পড়লো। উষাকে একটু ডেকে দিন।

–আমি বোধ হয় আপনাকে বিরক্ত করছি?

লীমা খুব বিপদে পড়লো, এই প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বলা অভদ্রতা, না বলা বিপদজনক। সাইদ অবশ্য উত্তরের অপেক্ষা করলো না। সে তার স্বভাবজাত সাফল্যে চোখ মুখ উদ্ভাসিত করে বললো, আপনাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। জীবনে কতো মেয়ে দেখলাম কিন্তু আপনার মতো কাউকে দেখিনি।

–কি আশ্চর্য! মাত্র তো পাঁচ মিনিটের পরিচয়, এর মধ্যেই এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন?

–কথায় বলে না, লেজ দেখলে বিড়াল চেনা যায়। আমিও আপনাকে দেখেই, আপনার ভেতরটা চিনে ফেলেছি।
লীমা চরম অস্বস্তি বোধ করলো। প্রথম সাক্ষাতেই যে ছেলে প্রেম নিবেদন করে বসে থাকে, দ্বিতীয় সাক্ষাতে সে কি করবে সেটি বেশ ভাবনার বিষয়।

রাজিয়া ড্রয়িংরুম ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন। –কে, লীমা নাকি?
–জ্বি খালাম্মা। আসসালামু ...
–বসো–বসো, কতক্ষণ এসেছো?
–এইতো একটু আগে।
–তা কি ব্যাপার?
–জ্বি উষার সাথে দেখা করতে এসেছি। ওতো বেশ কয়েকদিন ভার্সিটিতে যাচ্ছে না। তাই ভাবলাম অসুখ–বিসুখ করলো কি না।
–না অসুখ বিসুখ হবে কেন? আমরা ওর বিয়ে ঠিক করেছি।
–উষার বিয়ে? কি অবাক কাণ্ড। অথচ আমি কিছুই জানি না।
রাজিয়া মনে মনে খেপে উঠলেন। মেয়েটার ঢং দেখে। যেন সত্যই কিছু জানে না। স্পাই কোথাকার। –আগামী শুক্রবার বিয়ে। সময় পেলে এসো।
–জ্বি, তাতো আসবই। উষা কোথায়? ওর সাথে একটু ...
–ওর সাথে তো এখন দেখা হবে না। বিয়ের ব্যাপারে ও খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে। কারো সাথে কথাবার্তা বলছে না।
–আমার সাথে নিশ্চয় বলবে, আমি ওর সবচেয়ে ঘনিষ্ট বান্ধবী। আমার কাছে ও কিছু লুকায় না।
–না না, তুমি এখন যাও। বিয়ের পর যতো খুশি গল্প করো।
সাঈদ বিরক্ত হলো। –উষাকে একটু ডেকেই দাও না মা। উনি যখন এতো করে বলছেন ...
–তুই থাম। যা বুঝিস না, তা নিয়ে কথা বলিস না। লীমা তুমি এখন যাও। বিয়ের ঝামেলা কতো সেতো জানই, আমরা সবাই এখন খুব ব্যস্ত।
–না না, আপনাকে এখনই যেতে হবে না। আপনার যতক্ষণ খুশী বসুন। উষা না এলেই বা কি, আমি তো আছি।
–না তুইও থাকিস না। তুই এখন আমার সাথে নিউমার্কেটে যাচ্ছিস।
–নিউমার্কেট তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। ওখানে পরে গেলেও চলবে।
–না চলবে না। জলদি তৈরি হয়ে নে, যা।
–লীমা, আপনিও চলুন না আমাদের সাথে।
–না ও যাবে কেন?
–গেলেই বা অসুবিধা কোথায়?
–অসুবিধা আছে। ওসব তুই বুঝবি না। লীমা তুমি যাও।
লীমা প্রচণ্ডরকম অপমানিত বোধ করলো, তার মেজাজ খিঁচড়ে গেলো। কি শুধু যাও–যাও করছেন, আমি কি ভিখারী?
রাজিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলেন। –তুমি আমার সাথে এমনভাবে কথা বলছো কেন?
–কেন করবো না? এতো বয়স হলো অথচ সাধারণ ভদ্রতাবোধটুকু জন্মেনি, আপনার মতো মা থাকার চেয়ে, না থাকাই ভাল।
রাজিয়া ক্রোধে কাঁপতে লাগলেন। –এই মেয়ে তুমি এক্ষুণিই আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।
–যাবো তো বটেই। আপনার মতো মহিলার সাথে আমার কথা বলতেও রুচি হয় না। কিন্তু যাবার আগে আপনাকে কিছু উপদেশ দিয়ে যেতে চাই।
–আমি তোমার কোন কথা শুনবো না। সোজা বেরিয়ে যাও তুমি। নইলে দারোয়ান ডেকে ...
সাঈদ আর্তস্বরে বললো, ছিঃ মা, কি যা তা বলছো।
–আরে রাখুন, আপনার মতো কতো খানডারনী দেখলাম। সাহস থাকলে ডাকুন তো কাকে ডাকবেন। এহ্ দারোয়ানের ভয় দেখাচ্ছে আমাকে। আপনাদের বাড়িতে তো মোটে দুটো দারোয়ান, আমাদের বাড়িতে কটা আছে জানেন? পাঁচ–পাঁচটা।
পিজ লীমা, মায়ের কথায় কিচ্ছু মনে করবেন না। ওর মন মেজাজ ভালো নেই।

–বাজে কথা বলবেন না। ওর মন মেজাজ খুবই ভালো আছে, পারলে তো কোমরে আঁচল পেঁচিয়ে তিন পাক নেচে নেন। মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরূদ্ধে এক বদমাশ, লোচ্চা চশমখোরের হাতে তুলে দিচ্ছেন, নিজের মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে? মেয়েকে বিয়ে দিয়েইতো আপনি খালাস, কিন্তু ঐ লোচ্চার সাথে সংসারটা করবে কে শুনি? উষা না আপনি?
–লীমা তুমি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো ...
–আরে রাখেন আপনার সহ্যের সীমা। আপনার মতো মহিলাকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। জীবনে প্রেমের স্বাদ তো পান নি, প্রেমের মূল্য কি বুঝবেন? নিজের মেয়েটাকে গিনিপিগ বানিয়ে খুব পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। লজ্জায় আপনার মরে যাওয়া উচিৎ, ছিহ্ ছিহ্।

লীমা দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলো। রাজিয়া প্রচণ্ড রাগে কেঁদে ফেললেন। –শুনলি সাঈদ, শয়তান মেয়েটা কি সব যা তা বলে গেলো?
সাঈদ গম্ভীর মুখে বললো, দোষটা তোমারই। তুমিই ওকে প্রথমে অপমান করেছো। কাজটা তোমার মোটেই উচিৎ হয়নি।
–কি বললি, মেয়েটা কোন দোষ করেনি, সব দোষ আমার ...
–হ্যাঁ, তোমার। ঝামেলা পাকানোর আর সময় পাও না। আর মাত্র পাঁচটা মিনিট সময় পেলেই আমার একটা হিলে-হয়ে যাচ্ছিলো, সব কাঁচিয়ে দিলে। এর পর ঐ মেয়ে কি আর আমার দিকে ফিরেও তাকাবে।
রাজিয়া সশব্দে কাঁদতে লাগলেন। –এ কাদের পেটে ধরেছিলাম, হায়। সব শত্রু, সব স্পাই।

মোর্শেদরা সদর রাস্তায় গাড়িতে অপেক্ষা করছিলো। লীমাকে দেখেই তারা পড়িমড়ি করে ছুটে এলো। –কাজ হলো?
–চিঠিটা নিশ্চয় ঐ মহিলা গায়েব করেছিলেন?
–উদ্ধার করতে পারলেন?
–উষা আপার সাথে কথা হয়েছে?
লীমা চোখ গরম করে ধমকালো –কি কিচির–মিচির শুরু করেছো তোমরা, থামোতো।
–কি ব্যাপার মিস লীমা, কোন গোলমাল ...
মোর্শেদ অবাক হয়ে বললো, গোলমাল? আমার কি মনে হচ্ছিলো জানেন, ঐ মহিলার গালের উপর চটাস করে এক থাপ্পড় বসিয়ে দেই। ইতরের একশেষ, মিনিটে দশবার করে বেরিয়ে যাও করছিলো। রাগে আমার পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে।
মুকিত মাথায় হাত দিলো। –সর্বনাশ। আপনি কি খালাম্মার সাথে ঝগড়া করে এসেছেন।
–ঝগড়া করবো নাতো কি প্রেমালাপ করবো? দিয়েছি বেশ দুকথা শুনিয়ে। মনিষ্যির সন্তান হলে এরপর অন্তত লজ্জা হওয়া উচিত।
মোর্শেদ দুচোখ কপালে তুলে ফেললো। –কি বলছেন আপনি? গালাগালি করেননি তো আবার? হাজার হোক ভবিষ্যৎ–
–সে আশায় গুড়ে বালি। আগামী শুক্রবারেই উষার বিয়ে। কেনাকাটা পর্যন্ত শুরু হয়ে গেছে। বসে বসে আঙ্গুল চোষা ছাড়া এখন আর আপনার কিছুই করার নেই।
সাব্বির ফোঁড়ন কাটলো, চুষলে বুড়ো আঙ্গুলটাই চুষবেন কিন্তু, ওটাই যা একটু নাদুস–নুদুস।
মোর্শেদ উদাসীন গলায় বললো, তোমরা শুধু ঠাট্টা–মশকরাই করতে পারো, মানুষের দুঃখ–বেদনা বোঝো না। আমার মনের মধ্যে এখন যে তুলকালাম কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে তা যদি বুঝতে। সে বিকট শব্দে ক্রমাগত দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে লাগলো।

মোর্শেদের অব্যক্ত বেদনা লীমাকে আপুত ফেললো, তার চোখ অশ্রু সিক্ত হয়ে পড়লো, মোর্শেদ ভাই, আপনি এতো ভেঙ্গে পড়বেন না। যেভাবেই হোক অন্য একটা বুদ্ধি বের করতেই হবে। আর যদি সত্যি সত্যিই উষার বিয়ে হয়ে যায়, তাহলে আমি আপনাকে বিয়ে করবো। উষার চেয়ে আমি কোন অংশেই খারাপ না।
মোর্শেদ ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ করলো, জ্বি না, আমি উষাকে ছাড়া দুনিয়ায় অন্য কোন মেয়েকেই বিয়ে করবো না।
তাহলেতো বেশ ঝামেলাতেই ফেললেন। উষাকে তো ওরা একেবারে গৃহবন্দী করে রেখেছে, ওকে উদ্ধার করাই কঠিন সমস্যা। আমার মাথায় তো কোন বুদ্ধিই আসছে না ছাই? এই হনুমানের লেজগুলোতো খুব চটাং–পটাং বুলি ছাড়ে, এখন একটা বুদ্ধি বাতলাতে পারছে না।
হনুমানের লেজগুলির রসবোধ তীব্র, এই সুমিষ্ট সম্ভাষনে অতিশয় প্রীত হয়ে হ্যাহ্–হ্যাহ্ করে হাসতে লাগলো।

–আরে, কি গাধার মতো হাসছো শুধু?
মজনু হাসি হাসি মুখে বললো, লীমা আপা নো চিন্তা ডু ফুর্তি। এবার আমরা আমাদের তুরূপের তাসখানা ছাড়বো। ব্যাস, তাহলেই খেল খতম। বর বাবাজীকে ভিমড়ী খাইয়ে ছাড়বো এক্কেবারে? আমাদের চেনে নাতো?
মোর্শেদ ফিসফিসিয়ে বললো, ওদের কথায় কান দেবেন না। ওরা ঐরকম হাজার হাজার প্ল্যান বের করে, দিনের মধ্যে চব্বিশবার বর বাবাজীকে ভিমড়ী খাইয়ে ছাড়ে। ওদের বুদ্ধি শুনলে আপনার আমার দুজনারই নিশ্চিন্তে ফাঁসী হয়ে যাবে।
লীমা ভয়ে ভয়ে রাসেলদের পরখ করলো। এরা কি খুন খারাবীও করে নাকি? কি সর্বনেশে ব্যাপার? আগে জানলে কখনো ...
মোর্শেদ বিরক্ত হলো। –আপনি দেখছি ওদের চেয়েও বড় পাগল। সামান্য একটা ঠাট্টাও বোঝেন না।
–ঠাট্টা করছেন সেটা বলে দিলেইতো পারতেন। নিন, আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসুন। মা চিন্তা করবে।
–চলুন।
রাসেলরা গাড়িতে চড়লো না। তাদের নাকি কি একটা জরুরি কাজ রয়েছে। ছেলেগুলির ব্যস্ত–সমস্ত, উদ্বিগ্ন ভাবভঙ্গি মোর্শেদের কাছে সুবিধার মনে হলো না। না জানি তারা আবার কোন গ্যাঁড়া কলের সৃষ্টি করে।
দুপুর বারোটা। মুকিতদের বাসায় একটা বিপদজনক অভিযানের পূর্ব প্রস্তুতি চলছে। শাহেদ তার জীবনের সমগ্র অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ছটি প্রেম পত্রের খসড়া রচনা করেছে, এখন মুকিতের বড় বোন রীনাকে পটানো হচ্ছে সেগুলির পরিচ্ছন্ন রূপ দেবার জন্য। রীনা নানান টাল বাহানা করছে।
–হ্যাঁ, জীবনে একটা খুচরো প্রেমপত্র পর্যন্ত কাউকে লিখলাম না, আর এখন এক বৈঠকে ছ'ছ খানা লিখে ফেলবো। তোমরা কি আমাকে পাগল ঠাউরেছো?
মুকিত তিক্তস্বরে বললো, ধ্যাৎ আপা, তুই কি সত্যি সত্যিই প্রেমপত্র লিখছিস নাকি? তোর কাজ হচ্ছে এগুলোকে ফ্রেস করে দেয়া, ব্যাস।
–ঐ একই কথা হলো।
–তোর মাথা হলো? সব সময় একটা না একটা ঘাপলা বাধাবিই তুই।
–মুখ সামলে কথা বলবি ছোড়া, ঘাপলা আমি না তোরা বাঁধিয়েছিস?
রণক বেগতিক দেখে খাঁটি ঘাওয়া ঘিয়ের বৈয়ম খুললো।
–প্লীজ রীনা আপা, আর ঠাট্টা করবেন না। আমরা জানি মানুষের প্রতি আপনার কতো ভালোবাসা। আমরা না বললেও আপনি নিজেই হয়তো সেধে লিখে দিতেন। এগুলো যে নিছক প্রেমপত্র নয়, বরং দুটি প্রেমান্মাদ অবুঝ হৃদয়ের ভালোবাসাকে প্রতিষ্ঠিত করার এক মোক্ষম অস্ত্র, সে আর আপনার চেয়ে ভালো কে বোঝে বলুন?
রীনা চড় তুললো। –খুব তেল মারা শিখেছো, না?
–ছিঃ ছিঃ এই সমস্ত তেল–টেলে প্রসঙ্গ উঠছে কেন আবার?
রাসেলের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। –রীনা আপা, ফালতু সময় নষ্ট না করে ঝট্ পট্ লিখে ফেলুন তো। আমাদের হাতে এখনও অনেক কাজ।
রীনা হেসে ফেললো। –তোমার মতো বদমেজাজ ছোঁড়া আমি খুব কম দেখেছি। আমি কি একবারও লিখব না বলেছি? দাও কাগজ কলম দাও। প্রেমপত্র লেখাটা বোধ হয় খুব একটা নীরস কাজ নয়।
চিঠিগুলো ফ্রেস করতে গিয়ে রীনাকে অবশ্য প্রচুর হাসা–হাসি করতে হলো। দুবার অল্পের জন্য সে পেটে খিল ধরা থেকে রক্ষা পেলো। চিঠি লেখার এমন ছেলে মানুষী পন্থার কথা তার জানা ছিলো না। শাহেদ ক্রমশই লজ্জায় কৃষ্ণতর হতে শুরু করলো।
–এতো হাসছেন কেন রীনা আপা? ওগুলোর মধ্যে আমি কোন ঠাট্টা তামাশার কথাতো লিখিনি। ভালোবাসার কথা পড়ে এতো হাসা ঠিক না।
তোমার মাথা। এসব কি লিখেছো –ওগো আমার প্রিয়তম মোর্শেদ, তোমায় ছাড়া আমার পৃথিবী অন্ধকার, বেঁচে থাকা নিষ্ফল। আমার জীবনটা শুষ্ক মরু ভূমির মতো ছিলো, তুমি এসে মরূ দ্যান বানিয়ে দিলে, তুমি আমার প্রাণ, তুমিই আমার জান ... হিঃ হিঃ হিঃ ... একটা ছবছরের মেয়েওতো এরকম চিঠি লিখবে না হিঃ হিঃ হিঃ ...
শাহেদ গোমড়া মুখে বললো, মেয়েরা কিভাবে চিঠি লিখে তা আর আমাকে শেখাতে হবে না। আমার ড্রয়ারে এখনও দুডজন প্রেমপত্র পড়ে আছে। যদি বলেনতো এনে দেখাই।
–না না, ভাই তোমার চিঠি তুমিই দেখো। আমার কাজ ফ্রেশ করে দেয়া, আমি তাই করে দিচ্ছি, বাকিটা তোমরা সামলাওগে–হিঃহিঃ ... রীনা হাসিতে ফেটে পড়লো।

শাহেদ বিড়বিড়িয়ে উঠলো, প্রেম না করলে এই রকম দশা তো হবেই। ফাউ হাসার কোন মানে হয়?
মাসুদকে তার অফিসে পাকড়াও করা হয়েছে। চিঠিগুলো সে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।
রাসেল বিরক্ত হলো। –কি ব্যাপার, এতো হাসছেন কেন? প্রেম ভালোবাসা ইয়ার্কির বিষয় নয়।
–আমি কি তাই বলেছি? তবে কথা কি জানো, এই রকম ছেলে মানুষী প্রেম আমিও অনেক করেছি। এসব আসলে কিছু নয়। বিয়ে হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।
–জ্বি না, কিছুই ঠিক হবে না। কারণ মোর্শেদ ভাইকে না পেলে উষা আপা আত্মহত্যা করবেন।
মাসুদ হো হো করে হাসতে লাগলো। তোমরা মেয়েদের কিছুই জানো না। ওরা কখনই খুব গাঢ়ভাবে কাউকে ভালোবাসে না। তাছাড়া এই আত্মহত্যা করা–টরা ছোট অপরিণত বুদ্ধির মেয়েদের সাজে, উষার বয়সী মেয়েরা ওধরনের বোকামী করে না।

রণক আতংকে দুচোখ গোল করে ফেললো। –আপনি উষা আপাকে চেনেন না। ওর দ্বারা সবই সম্ভব, নইলে কি কেউ বিয়ের আগে সর্বস্ব খোয়ায়।
মাসুদ অবাক হয়ে জানতে চাইলো, সর্বস্ব মানে?
–সর্বস্ব মানে বুঝলেন না? মেয়েদের তো আছেই একটা জিনিষ হেঃ হেঃ ... নিশ্চয় ধরতে পেরেছেন। তাও কি এক-আধবার, এসবতো নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার ছিলো। হোটেলের কামরাতো আমরাই বুক করতাম, বড়ি-টড়িও হেঃ হেঃ ...
মাসুদ এতোখানি আশা করেনি। সে চরম অস্বস্তি নিয়ে কুল কুল করে ঘামতে লাগলো।
সাব্বির সুযোগ বুঝে যোগ করলো, শুধু কি তাই, ওদের কিছু অন্তরঙ্গ ছবিও রয়েছে দেখলে বমি আসে। মাগো। ওনার মতো মেয়ে এইসব করতে পারে, আমিতো চিন্তাই করতে পারি না।
জাকেরের পক্ষে নিঃশব্দে বসে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। সে মুখের অর্গল খুলে দিলো। –আরে ভাই আরেকবার কি হয়েছিলো জানেন? উষা আপা এবং মোর্শেদ ভাই দুজনই লাপাত্তা। পাক্কা ছদিন পর তাদেরকে উদ্ধার করা হলো কক্সবাজারের এক কটেজ থেকে। অবস্থাটা চিন্তা করতে পারেন? এইবার ভালো করে ভেবে দেখুন, এই রকম একটা মেয়েকে জেনে শুনে বিয়ে করবেন কি না?
মাসুদ বেশ চঞ্চল হয়ে পড়েছে। এই ছেলেগুলির কথা যদি শতকরা দশভাগও সত্য হয় তাহলেও বুঝতে হবে এই মেয়েটির স্বভাব চরিত্র সুবিধার নয়। কিন্তু তার পরেও কথা থাকে, এতো সুন্দর এবং আকর্ষণীয় মেয়ে সে জীবনে কখনো দেখেনি। আপেলের মতো দুটি রাঙ্গা গাল, কমলার কোয়ার মতো ঠোঁট, অপূর্ব দেহবল্লরীর ছন্দময় বাঁকগুলি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে যেন?
মজনু ভালো মানুষী কণ্ঠে পরামর্শ দিলো, দেখুন ভাই, আমরা আপনার ভালো চাই বলেই এতো খাটা–খাটুনি করে আপনাকে খুঁজে বের করেছি। দেখলে বোঝা যায় আপনি অত্যন্ত সহজ–সরল মানুষ, উষা আপার মতো মেয়েকে বিয়ে করলে জীবনে একটা মারাত্মক ভুল করবেন।
মাসুদ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো। –আমার কোন উপায় নেই ভাই। উষাকে দেখেই আমি পাগল হয়ে গেছি। যদি শুনতাম এর আগে ওর তিনবার বিয়ে হয়েছিলো, এক ডজন ছেলেমেয়ে আছে তবুও ওকে বিয়ে করা ছাড়া আমার গতি থাকতো না। জানো, আজকাল রোজ রাতে ওকে স্বপ্নে দেখি।
শাহেদ তীব্র কণ্ঠে বললো, আপনার কি মাথা খারাপ? সব জেনে শুনেও এই মেয়েকে বিয়ে করবেন? আমি হলেতো এমন মেয়ের পেছনে গুনে গুনে ছবার লাথি কষতাম?
–শুধু উষার দোষ দিয়ে কি লাভ বলো? আমি নিজেওতো আর সাধু–সন্যাসী নই। কদিন আগেও একটা মেয়ের সাথে আমার খুব দহরম মহরম ছিলো। বিয়ের আগে সবার এরকম একটু বদনাম থাকে, ও কিছু না।
রণক একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। –ভেবেছিলাম এই কথাটা আর বলবো না। কিন্তু এখন দেখছি না বললেই নয়। উষা আপা দুবার গর্ভপাত পর্যন্ত করিয়েছে।
প্রত্যুত্তরে মাসুদ দীর্ঘতর নিশ্বাস ছাড়লো। –আমার কপালটাই খারাপ, এমন মেয়ের প্রেমে পড়ে গেলাম। কিন্তু কি করবো বলো, মন যে কিছুই মানে না। উষাকে না পেলে আমিও বাঁচবো না।
রাসেল ক্ষ্যাপা গলায় বললো, আপনাকে হেমায়েতপুর পাঠানো উচিৎ।

এহেন প্রস্তাবেও মাসুদকে বিন্দুমাত্র বিচলিত মনে হলো না। সে তার সিদ্ধান্তে অটল হয়ে রইলো। পরবর্তী আধঘন্টায় প্রচুর তর্জন গর্জন করেও যখন মনোভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন সাধন করা গেলো না তখন ক্ষুব্ধ চিত্ত বিচ্ছুগুলি কিছু কটু বিশেষণ প্রয়োগ করে স্থান ত্যাগ করলো। ব্যর্থতার গ্লানিতে তাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে।
ঠা-ঠা রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাসেল উচ্চঃস্বরে মাসুদের চৌদ্দ গোষ্ঠির প্রতিটি নারীর চরম সর্বনাশ করতে লাগলো। রণক বিষন্ন স্বরে বললো, ব্যাটাকে গুম করে দিলে কেমন হয়?
রাসেল গর গর করে উঠলো, ব্যাটার গুষ্টিশুদ্ধ খুন করে দিলে কেমন হয় তাই বল।
সাব্বির অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললো, বেড়ে বলেছিস। গুষ্ঠি।
–মানে? তুই কি সত্যি সত্যিই ...
–মাথা খারাপ?
–তাহলে?
–মালিবাগে চল। ওর গুষ্ঠির পিণ্ডি চটকাবো।
–কি যা তা বলছিস।
–যা তা নয় রে। এই শালা না হয় উষা আপার রূপ দেখে মজেছে, কিন্তু মা-বোনদের নিয়ে তো আর সেই সমস্যা নেই। তারা যদি শোনে যে মেয়ের দুবার এ্যাবরশন হয়েছে তাহলে কি রকম তুলকালাম কাণ্ডটা বাঁধবে চিন্তা করতে পারিস?
রাসেল হুঙ্কার ছাড়লো, এই ট্যাক্সি।
ঘটনা শুনে মাসুদের মায়ের মুখ মৃতের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। বোন দুইটি কিংকর্তব্যবিমুঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। রাসেলের ভয় হলো এরা হয়তো তিনজনই একযোগে হার্টফেল করবেন। সে নরম গলায় বললো, ভালো করে ভেবে চিন্তে দেখুন, এখানে আপনারা সম্পর্ক করবেন কি না। আমরা যা বলেছি সবই সত্যি, বিশ্বাস না হলে খোঁজ খবর নিয়ে দেখতে পারেন।
বড় বোনটি রাগী স্বরে বললো, মেয়েটাকে দেখেই আমি বুঝেছিলাম ওর স্বভাব চরিত্র ভালো নয়। আমাদেরকে সেদিন কি অপমানটাই না করলো। চেহারাখানা সুন্দর কিনা, দেমাগে আর মাটিতে পা পড়ে না বেটির।
ছোট বোনটি নাক সিটকালো। ইস কিরে আমার চেহারা? অমন সুন্দরী মেয়ে ঢাকা শহরে গণ্ডা গণ্ডা পাওয়া যায়। যার চরিত্রের ঠিক-ঠিকানা নেই তার আবার অহংকার। অমন মেয়ের মুখে আমি থুথু দেই না?
শাহেদ প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে লাগলো, সুযোগ পেয়ে এরা উষা আপাকে যা তা বলে নিচ্ছে।
মা শীতল গলায় বললেন, তোমাদের কাছে চিঠিগুলো আছে।
–নিশ্চয়। রাসেল চিঠির বাণ্ডিলটা তার হাতে তুলে দিলো।
চিঠিগুলো পড়ে তিনি একেবারেই উজবুক বনে গেলেন অনেক দিনের সম্পর্ক মনে হচ্ছে।
জাকের তরবড়িয়ে উঠলো, অনেক দিনের বলছেন কি, বলতে গেলে তো সেই হামাগুড়ি দেবার উফ্, কি হলোরে রাসেল।
বড় বোনটি কড়া স্বরে বললো, মা, এই বিয়ে কিছুতেই হবে না। আমাদের ফ্যামিলির একটা সুনাম আছে, এই মেয়ের জন্য আমরা সেটা খোয়াতে পারি না।
ছোট বোনটি কণ্ঠ মেলালো, বড় আপা ঠিকই বলেছে মা। ঘটনা শুনে তো মনে হচ্ছে এই মেয়ে প্রায় বেশ্যা ধরনের।
–না না, তা নয়।
–তোমরা চুপ করো। কি হলো মা, কিছু বলছো না কেন?
–আমি কি বলবো? মাসুদ তো এই মেয়েকে বিয়ে করবে বলে পণ করেছে।
–একটা ফালতু সংকল্প করলেই হলো? আমাদের মান ইজ্জতের কি কোনই দাম নেই? আজ ভাইয়া এলে তুমি স্পষ্ট করে বলে দেবে, এই বিয়ে হবে না।
–ওকি আমার কথা শুনবে রে? বড্ড জেদী ছেলে যে। তার চেয়ে তোর মামাকে ডাক। ওর কথা মাসুদ ফেলতে পারবে না।
মামা ভদ্রলোকটি ছোটখাটো একখানি পর্বত বিশেষ, গাত্রবর্ণ ঘোর অবানিশা। তিনি কুতকুতে দুটি চোখে রাজ্যের কৌতুহল নিয়ে রাসেলদের বাতচিত শুনলেন। চিঠিগুলি পড়তে পড়তে তিন দফা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। তার ভাবভঙ্গী নিতান্ত সুবিধার মনে হলো না। –চিঠিগুলো কে লিখেছে?
–কেন, উষা আপা।
মামা রাসেলের আপাদমস্তক চোখ বোলালেন। –তাই নাকি?

–তোমরা এগুলো কোত্থেকে পেলে?
–মোর্শেদ ভাইয়ের কাছ থেকে।
–প্ল্যানটা তাহলে সেই ছোঁড়ার?
মামা হাঃ হাঃ শব্দে হাসতে লাগলেন। –বুঝলে বাবারা, ছোটবেলায় আমিও এই রকম দুচারটি অভিযানে গিয়েছিলাম, দুএকটা বিয়ে পরে ভেঙ্গেও যায়, তখন এসব করতে দার্র ন ভালো লাগতো। তোমাদের আমি কোন দোষ দেই না। বয়সের দোষ।
–মানে? আপনি কি যা–তা বলছেন।
–কেন, আমি কি খুব জটিল কিছু বলেছি?
সাব্বির খুক্ খুক্ করে কাশলো। –না মানে, আরেকটু খোলাসা করে বললে ভালো হয়।
–বেশ, খোলাসা করেই বলি। প্রথম কথা, এই চিঠিগুলো উষার লেখা নয়। ওর হাতের লেখা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ও আমার কাছে কিছুদিন প্রাইভেট পড়েছিল। দ্বিতীয় কথা, ওর পেটে যদি সত্যি সত্যি বাচ্চা আসতো তাহলে ও সঙ্গে সঙ্গে মোর্শেদকে বিয়ে করে ফেলতো, কারণ আর যাই হোক উষা বোকা নয়। তৃতীয় কথা, কক্সবাজারে গিয়ে পালিয়ে থাকার ব্যাপারটি পুরোপুরি বানোয়াট। তেমন কিছু যদি সত্যি সত্যিই ঘটতো তাহলে নিশ্চয় খবরের কাগজে চলে আসতো। এমন রসাত্মক একটি ঘটনা কখনই সাংবাদিকদের দৃষ্টি এড়াতো না। চতুর্থ ...
সাব্বির নাকের ডগায় জমে থাকা ঘাম মুছলো। –ব্যাস, ব্যাস, যথেষ্ট হয়েছে। আমরা আর শুনতে চাই না।
–বড়ই আফসোসের কথা। ভেবেছিলাম আট-দশটা ব্র টি উড়িয়ে দিয়ে তোমাদেরকে একেবারে হতবাক করে দেবো ...
–যাই হোক, এবার বলো তোমরা কি ভালোয় ভালোয় যাবে না থানায় খবর দেবো?
রণক বিগলিত স্বরে বললো, না না ছিঃ ছিঃ আপনি কষ্ট করতে যাবেন কেন? আমরা নিজেরাই পথ চিনে যেতে পারবো। যাই মামা, দোয়া করবেন।
রণককে গুটি গুটি পায়ে দরজার দিকে এগুতে দেখে বাকীরাও বিনাবাক্যে তাকে অনুসরণ করলো। মামা পেছন থেকে বললেন, সে কি, চিঠিগুলো না নিয়েই চলে যাচ্ছো যে?
রাসেল ভেঙচি কাটলো। –আর ইয়ার্কি মারতে হবে না, শালা ঘটৎকোচ কোথাকার?
–এই, কি বললে? এ্যাঁ এই টুকুন ছেলের সাহস কতো। পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেইনি এটা তোমাদের কপাল, বুঝেছো?
–আপনাকেও আমরা রাস্তায় পেয়ে নেই একবার, ঠেঙিয়ে ঠ্যাঙ ভেঙ্গে দেবো। শালা বেকুফ। ... তেড়ে আসায় তাকে এই পর্যায়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে পালাতে হলো। রাস্তায় পৌঁছে সে গলার রগ ফুলিয়ে ডজন ডজন উৎকৃষ্টমানের গালাগালি প্রয়োগ করলো।
সাব্বির গম্ভীর হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এতো গোয়েন্দা জন্মেছে, এ খবর তো জানতাম না রে?
মুকিত মৃদুস্বরে বললো, শার্লক হোম্সও ফেল্টুস মেরে যেতো এদের কাছে।
রাসেল রাগে লাল হয়ে উঠেছে। সে আকাশ বাতা প্রকম্পিত করে বললো, শার্লক হোম্স? শালার ব্যাটাকে রাস্তায় পেয়ে নেই ঠেঙিয়ে বাপের নাম না ভুলিয়েছি তো নাম বদলে গর্দব কুমার রাখবো। শালার শার্লকসগিরি ঘুচিয়ে দেবো। ব্যাটাছেলে পুরো প্ল্যানটাই ভচ্কে দিলো।
তারা ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ফিরতি পথ ধরলো এবং পরবর্তী এক ঘন্টার মধ্যেই দুটি গোলমাল পাকিয়ে তুললো। প্রথমটি বাসে, কন্ডাকটর ভাড়া চাওয়ায় রাসেল দুম করে তার নাকের ডগায় একটি ঘুষি বসিয়ে দেয়, ছেলেটি নাক দিয়ে দর দর করে রক্ত ঝড়তে দেখে আরোহীদের মাথা গরম হয়ে উঠে, ফলস্বরূপ রাসেলদের চলন্ত বাস থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করতে হয়।

দ্বিতীয়টি হাতি সড়কে, একটি মেয়েকে লক্ষ্য করে বাজে মন্তব্য করায় ঘটনা প্রথমে মনোমালিন্য, পরে কথা কাটাকাটি এবং পরিশেষে হাতাহাতিতে রূপ নেয়। দুমিনিটের মাথায় চশমা হারিয়ে রণক চোখে শর্ষের ফুল দেখতে থাকে।

সাত

গভীর রাত। উষার ঘুম আসছে না। তার চোখে সমগ্র ভবিষ্যত আজ নিগুর অন্ধকারে ঢাকা। মোর্শেদের সাথে যোগাযোগের সমস্ত পথ বন্ধ। পিতা-মাতার প্রতি প্রচণ্ড অভিমান বোধ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তবে কি এতোদিনের এতো স্নেহ ভালোবাসার পেছনে তাদের এই কুটিল ষড়যন্ত্র লুকিয়ে ছিলো। গত কয়েকদিনে সে প্রচুর অশ্রু বিসর্জন করেছে কিন্তু কোন লাভ হয়নি। একটি অপরিচিত অনাহত পুরুষের হাতে তাকে সঁপে দেবার জন্য সকল যোগ–যজ্ঞই প্রস্তুত, এখন শুধু শুভক্ষণের অপেক্ষা।

উষা নিজেকে বলী দিতে প্রস্তুত নয়। অন্যের বিকৃত সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে সমর্পন করার আদৌ কোন ইচ্ছা তার নেই। সে একটি বিপদজনক পরিকল্পনা এটেছে। যেভাবেই হোক এই বাসা ছেড়ে তাকে পালাতেই হবে। নিজের জীবনটাকে একান্ত আপন ইচ্ছায় সাজাবার অধিকার প্রতিটি মানুষেরই আছে।

উষা প্রচুর কৌশল খাটিয়ে সুদীর্ঘ এক টুকরো রশি যোগাড় করেছে। যখন বুঝলো, বাসার সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে তখন সে সক্রিয় হয়ে উঠলো। রশিটিকে রেলিঙে গিট দিয়ে বেঁধে প্রচুর কসরৎ করে তাতে ঝুলে পড়লো। মাটিতে পা ঠেকতেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এলো। রশি বেয়ে উঠানামার ব্যাপারটি তার কাছে বরাবরই অত্যন্ত দুরূহ মনে হয়েছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে প্রয়োজনের সময় সবকিছুই জলবত তরলং হয়ে উঠে।
তার ভাগ্য খারাপ। কারণ দুপা এগুতেই একটি বিশালদেহী মোচুয়া লোক পথরোধ করে দাঁড়ালো।
–আপা এমন কাজ করবেন না। আপনার বাবা মা খুব দুঃখ পাবেন।
–রমজান, আমাকে যেতে দাও। আমি তোমাকে দুশো টাকা দিচ্ছি।
–না আপা, সাহেবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না।
–রমজান, ওরা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে বিয়ে দিচ্ছে। আমি একটা ছেলেকে ভালোবাসি, তাকে না পেলে বাঁচবো না। আমাকে যেতে দাও, রমজান। আমার কাছে পাঁচশো টাকা আছে, সবটাই তোমাকে দিয়ে দেবো।
রমজান কোন উত্তর দেয় না, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।
–আমাকে যেতে দেবে না, রমজান?
–না আপা। আপনি ঘরে যান। এই ঘটনা আমি কাউকে বলব না।
উষার দৃষ্টি অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠলো। –তোমরা মানুষ নও, রমজান। মানুষের দুঃখ কষ্ট বোঝ না।
–ঠিক বলেছেন, আপা, আমরা মানুষ নই, দারোয়ান, পোষা কুকুরের মতন।
উষাকে ফিরে যেতে হলো। প্রবল দুঃখানুভূতিতে তার কোমল হৃদয় জর্জরিত হয়ে উঠেছে, সে অঝোরে কাঁদতে লাগলো।

সকালে রহিমার মা নাস্তার ডাক নিয়ে এলো। –আফা, খাইবেন না।
রক্তজবার মতো চোখ তুলে চাইলো উষা। –না।
–আম্মায় ডাকতাছে।
মাকে গিয়ে বলো, আমি খাবো না। এখনও না, পরেও না। না খেয়ে খেয়ে মরে যাবো, অনশন ধর্মঘট।
রহিমার মা এতো কথা বোঝে না। কিন্তু তার বড় বেদনাবোধ হয়। আজ দুবছর সে এই পরিবারে ঝিয়ের কাজ করছে, এই মেয়েটির ব্যবহারে সে কখনো কোন রূঢ়তার চিহ্ন দেখেনি। মেয়েটিকে তার ভালো লাগে। এর জীবনে যে অশনি সংকেত দেখা দিয়েছে তার খবর সেও রাখে, কিন্তু নিরুপায় দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া কিছুই করার থাকে না।
–আফা, পাগলামি কইরেন না। আহেন, খাইয়া লন। না হয় একটা বিপদ আইছে, তাই বইলা এতো ভাইঙা পড়লে চলবো?
–আমার যে কি বিপদ সে তুমি বুঝবে না, বুয়া। বাবা-মা জোর করে আমাকে একটা শয়তানের হাতে তুলে দিচ্ছে, মরা ছাড়া আমার আর গতি কি?
রহিমার মার মুখে বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠলো। –হগলইতো হুনছি আফা। কিন্তু কি করুম কন? আমি অইলে এই রহম কাম মইরা গেলেও করবার পারতাম না। বাপ-মা অইয়া এই রহম জালেমের লাহান কাম। ছিঃ ছিঃ।
চকিতে একটি বুদ্ধি খেলে যায় উষার মাথায়। –একটা কাজ করতে পারবে?

–কন না, পার্র ম না ক্যান ।
–পাশের বাসার মুকিতকে চেনো তো? ছোটখাটো, নাদুস–নুদুস ছেলেটা ...
–হঁ, হঁ, খুউব চিনি ।
–ওকে একটা চিঠি দিয়ে আসতে পারবে?
–খুউব পার্র ম । আফনে লেইখ্যা দ্যান ।
উষা কাঁপা কাঁপা হাতে দুছত্র লিখে কাগজটি রহিমার মার হাতে ধরিয়ে দেয় । –খবর্দার কেউ যেন টের না পায় বুয়া, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে ।
–কেউ ট্যার পাইবো না, আফা । রহিমার মা অতো বুকা না । আফনে এইবার খাইয়া লন । চিঠি আমি ঠিকই পৌঁছাইয়া দিমুনে ।
–না বুয়া, আমার খাবার র্র চি নেই । তুমি ওটাকে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করো । এই অত্যাচার আমার আর সহ্য হচ্ছে না ।
–কিচ্ছু ভাইবেন না । ঘন্টাতক পরে গিয়া দিয়া আসুমনে ।
–খুব সাবধানে যাবে । কেউ দেখে ফেললে তোমার খুব বিপদ হবে ।
–কেউ দেখবো না আফা । আমি খুব হুঁশিয়ার মানুষ । মেয়েটির একটি উপকার করতে পারছে এই চিন্তায় রহিমার মায়ের মন পরম তৃপ্তিতে ভরে ওঠে । সে গুন গুন করে একটি গানও ধরে, যৌবন বয়সে পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে কি লাভ?

উষার পত্রখানি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ।
–মোর্শেদ, আমার বিয়ের আর মাত্র দুদিন বাকী । যা করার এর মধ্যেই করো, নইলে, আমি আত্মহত্যা করবো–উষা ।
মোর্শেদ তার বিচ্ছুবাহিনী নিয়ে গভীর দুঃশ্চিন্তায় নিমগ্ন ছিলো । চিঠিখানি পড়েই সে বিকট শব্দে হায়–হায় করে উঠলো । –এই পৃথিবীতে যদি উষাই না থাকলো তবে আর মোর্শেদের বেঁচে থেকে কি লাভ? আমিও আত্মহত্যা করবো ।
রাসেল ধমকে উঠলো, কি আবোল তাবোল কথা বলছেন? শুক্রবারের আগেই আমরা উষা আপাকে উদ্ধার করবো ।
–করবে? কিন্তু কি করে? ওদের বাসাটাতো এখন ব্যাংকের সেফটি ভল্টের চেয়েও দুর্গম । কার সাধ্যি সেখান থেকে আমার উষাকে উদ্ধার করে আনে । কেন অযথা মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছো ভাই? সব শেষ হয়ে গেছে ।
–কিচ্ছু শেষ হয়নি । চলুন আজ রাতেই একটা কমাণ্ডো হামলা চালিয়ে উষা আপাকে ছিনিয়ে আনি ।
–রাসেল একটা কথা বলি । কিছু মনে করো না কেমন?
–বলুনই না
–তোমার মাথায় নাট বল্টুর অভাব আছে । তোমার প্ল্যান মতো কাজ করলে আমার চৌদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হবে । জেল থেকে বের হবো উষার ছেলেমেয়েরা তখন হাই স্কুলে পড়বে ।
রাসেলের মুখ কালো হয়ে উঠলো ।
সাব্বির বললো, আমার একটা বুদ্ধি আছে । বলবো?
–বলো, বলো । লজ্জা কিসের? আমিতো এমনিতেও শেষ অমনিতেও শেষ ।
–ধর্র ন ঘুমের ওষুধ খাইয়ে বাড়িশুদ্ধ সবাইকে যদি স্লিপিং করিয়ে দেয়া যায় তখন আমাদের জন্য পুরো ব্যাপারটাই কিন্তু পাক্কা ভাত হয়ে যাচ্ছে । কি বলেন?
–কি আর বলবো? এখন পর্যন্ত কোন প্ল্যানেই তো কোন কাজ হলো না । এটাতেও যে হবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? সবচেয়ে বড় কথা, বিড়ালের গলায় ঘন্টাটা বাঁধবে কে?
–কেন, রহিমার মা ।
–সে বেটি যদি রাজি না হয়?
–ওর ঘাড় রাজী হবে । কি বলিস মুকিত?
–একশবার হবে । উষা আপার জন্য রহিমার মা সবকিছু করতে পারে ।
রণক বললো, বুদ্ধিটা কিন্তু ভালোই । খান বিশেক সিডাক্সিনেই কাজ হবে, কি বলিস?
–না হয়ে যাবে কোথায়? চল বেরিয়ে পড়ি, হাতে সময় কম । যা করার আজ রাতেই করতে হবে ।
রাসেল লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো । –চল্ । ব্যাটারা বড্ড বেড়েছে, একটু টাইট দেয়া দরকার ।

মোর্শেদ মৃদুস্বরে বললো, আর যাই করো ভাই, মামা বাড়ি যাবার ব্যবস্থা করো না। সেখানে শুনেছি বড় কষ্ট।
–কোন চিন্তা নেই, মোর্শেদ ভাই। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা থাকতে আপনার কিসের দুর্ভাবনা।
তারা টগবগে উত্তেজনায় ফুটতে ফুটতে বেরিয়ে গেল। মোর্শেদ হতাশ ভঙ্গিতে উষার দুছত্রের পত্রখানি বারংবার পড়তে থাকে। প্রবল মানষিক যন্ত্রণা তাকে অভূভুত করে ফেলে। সে হঠাৎ তার চোখের কোণে শীতল জলের স্পর্শ পায়। আজ কতো বছর পর সে আবার কাঁদলো।
সিদ্দিক রাতে খেতে বসে শুনলেন, উষা সকাল থেকে কিছু খায়নি। সে নাকি অনশন ধর্মঘট করেছে। তিনি দুচোখ কপালে তুলে ফেললেন।
–অনশন ধর্মঘট করেছে মানে? ইয়ার্কি পেয়েছে নাকি, এ্যাঁ তুমি কি বসে বসে ঘোড়ার ঘাস কাটো? আমাকেও তো কিছু জানাতে পারতে। এতোটা বয়েস হলো, এখনও এইটুকু বুদ্ধি হয়নি।
রাজিয়া রেগে গেলেন। –একদম বাজে কথা বলবে না। তোমার মেয়ে না খেতে চাইলে আমি কি করবো? জোর করে মুখে তুলে খাইয়ে দেবো? এতোই যদি দরদ তো যাওনা, ডেকে নিয়ে এসো। দেখো কিছু খাওয়াতে পার কিনা?
–তাই যাচ্ছি, তোমাকে দিয়ে যখন কিছুই হবে না তখন সবকিছু তো আমাকেই করতে হবে?
–খবর্দার, এই সব ফালতু কথা আমার সাথে বলবে না।
–তোমার সাথে বলবো না তো কি রাস্তার মেয়ে ছেলেদের ডেকে বলবো ... গজ গজ করতে করতে উষার ঘরে ঢুকলেন সিদ্দিক সাহেব।
উষা বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়েছিলো। টেপ রেকর্ডারে হেমন্তের একটা বেদনা বিধুর গান বাজছে, 'আজ দুজনার দুটি পথ...' এই গানটি আজ সারাদিনে অজস্রবার শুনেছে সে, তবুও তারা আশা মিটছে না, এবং যতই শুনছে ততই তার হৃদয় এক মর্মান্তিক বিরহ ব্যথাতে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে। ক্ষীণ ঝর্ণার মতো গণ্ড বেয়ে নামছে অশ্রু ধারা।

বাবাকে দেখে উষার মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া হলো না। সিদ্দিক ক্যাসেট পেয়ারটি বন্ধ করে দিলেন। –এসব কি হচ্ছে উষা? পাগলামী করারও একটা সীমা থাকা উচিত।
উষা ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলো। –গানটা বন্ধ করো না, বাবা। তোমার দোহাই লাগে। এই গান বন্ধ হলে আমি মরে যাবো।
সিদ্দিক ভড়কে গেলেন। –ঠিক আছে, ঠিক আছে, গান শুনবি সেতো ভাল কথা। কিন্তু তুই খাওয়া দাওয়া বন্ধ করেছিস কেন? দুদিন বাদে তোর বিয়ে ...
–বিয়ে বলো না বাবা, বলো বিসর্জন। শুধুমাত্র নিজেদের খুশীর জন্য তোমরা আমাকে এমনিভাবে বিকিয়ে দিচ্ছো? আমি ভাবতেও পারি না বাবা ... উষা বিকট শব্দে কাঁদতে লাগলো।
সিদ্দিক ঘন ঘন মাথা চুলকাতে শুরু করলেন। –আমরা যে তোর ভালোর জন্য এসব করছি মা।
–ভালো? কিসের ভালো? আমিতো ঐ নল খাগড়ার ভূতটাকে বিয়ে করতে চাই না।
–আচ্ছা এই ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটা হলো ভূত, আর ঐ কালো, কুচ্ছিৎ, নচ্ছার পাজীটা খুব হ্যাণ্ডসাম। চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি তুই?
–বাবা, ভালোবাসাতো যুক্তি মানে না। যার নয়নে যারে লেগেছে ভালো–আমিতো ঐ নচ্ছার পাজীটাকে ছাড়া বাঁচবো না।
–কি বাজে বকছিস? ও আমার জানের দুষমনের ছেলে? এইতো বছর খানেক আগেও আমার দোকান লুট করেছে ঐ গুণ্ডা, আমার লোকজনদের চুল কামিয়ে নেড়া বেল বানিয়েছে। তুই কি ভেবেছিস এতো কিছুর পরও ঐ অকালকুস্মান্ডের হাতে আমি আমার মেয়েকে তুলে দেবো? কাভি নেহী।
–তাহলে আমিও আর বাঁচতে চাই না বাবা। একদিন সকালে উঠে দেখবে তোমাদের উষা আর নেই, নীরবে, নিভৃতে সমস্ত অভিমান বুকে নিয়ে সে অনেক অনেক দূরে চলে গেছে। উষার উদাসীন দৃষ্টি জানালা গলে অন্ধকার আকাশ পথে হারিয়ে গেলো।
সিদ্দিক এলোমেলো পায়ে ড্রয়িংরুমে ঢুকলেন, চোখে মুখে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার চিহ্ন। রাজিয়া ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলেন। –কি হলো, ফিরেও তাকালো না বুঝি?
সিদ্দিক থম্‌থমে মুখে রাজিয়াকে ভস্ম করলেন।

–ইয়ার্কি মেরো না, এখন ইয়ার্কি মারার সময় না। উষার কথাবার্তা আমার কাছে মোটেও ভালো ঠেকছে না। ওর দিকে লক্ষ্য রাখো। কখন কি করে বসে কোন ঠিক নেই। এদিকে কথা দেয়া হয়ে গেছে এখন কোন ঝামেলা হলে ভারী লজ্জার ব্যাপার হবে।
–আত্মহত্যার ভয় দেখাচ্ছে বুঝি?
–হ্যাঁ, আরো কি সব বলছে। সব বুঝতে পারলাম না। মাথাটা একদম বিগরে গেছে।
–ও কিছু না, বিয়ে হলেই ঠিক হয়ে যাবে। তুমি দুশ্চিন্তা করো না।
সাঈদ গম্ভীর গলায় বললো, আরেকটু ভেবে দেখলে ভালো হতো না মা?
রাজিয়া ছেলের কথায় কান দিলেন না। –আরেকটু গোশ্‌ত নিবি বাবা?
–না না কেমন যেন তিতা তিতা লাগছে। তোমরা আজকাল গোশতের সুক্তি রাঁধো নাকি?
–কি যা তা বলছিস? গোশতের আবার সুক্তি হয় নাকি?
–খেয়েই দেখো না।
রাজিয়া এক টুকরো মাংশ মুখে দিয়েই নাক চোখ কুঁচকিয়ে ফেললেন। –সে কি। এরকম টেস্ট হলো কেন? নাহ্‌, রহিমার মার আজ–কাল কাজ কর্মে কোন মন নেই। এটা বরং খেয়ে কাজ নেই, কলিজাটা নে।
মাংশের ভুনাটা অনাদরে অবহেলায় পড়ে রইলো। রহিমার মা মুখ ব্যাজার করে ফেললো। কারণ এই ধরনের ঘটনার পরিণতি অত্যন্ত বিষাদক্ষিণ্ন। বেগম সাহেবা খুবই হিসাবী মানুষ, কোন রকম অপচয় পছন্দ করেন না, তিনি সম্পূর্ণ তরকারিটি তাকেই খাইয়ে ছাড়বেন। সে মনে মনে দোয়া দুরূদ পড়তে লাগলো, এবারের মতো প্রাণে বেঁচে গেলে ভবিষ্যতে কারো কোন সাথে–প্যাঁচে সে আর থাকছে না।
রাসেলরা ব্যর্থতাজনিত প্রবল শোকে কাতর হয়ে ঢিল ছুড়ে সিদ্দিক সাবের শান্তির নীড় এ প্রবল অশান্তির সৃষ্টি করে মোট তেরোটি কাঁচ ভেঙ্গে ফেললো।
রাসেলদের গম্ভীর রোষদীপ্ত মুখশ্রী দেখেই যা বোঝার বুঝে নিলো মোর্শেদ। সে এমনটি আশা করেছিলো। অপারেশন ফেইলড্‌?
–অপারেশনের পিণ্ডি চটকাই। রাসেল তিক্তস্বরে বললো।
রণক চশমাটিকে নিয়ে কি করবে বুঝতে পারছে না। সে কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, ব্যাটাদের কেমন আক্কেল দেখুন তো। এমন একটা মারাত্মক প্ল্যান পর্যন্ত মচ্‌কিয়ে দিলো, উষা আপাকে বোধ হয় আর উদ্ধার করা গেলো না।

মজনু বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। –হ্যাঁহ্‌ তাইতো মনে হচ্ছে।
মোর্শেদ বললো, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। খুব ঝুঁকি আছে অবশ্য, কিন্তু এ ছাড়া আর কোন উপায়ও দেখছি না।
দলটি একযোগে লাফিয়ে উঠলো। –তাই নাকি। প্ল্যানটা তাড়াতাড়ি ফ্ল্যাস করুন, সফল করার দায়িত্ব আমাদের।
অনেক ভেবে দেখলাম, উষাকে যদি যে কোন ভাবে ওদের বাসার গণ্ডী থেকে বের করা যায় তাহলে ওকে ছিনিয়ে আনাটা আমাদের জন্য সুবিধাজনক হবে।
–তাতো বটেই।
–কিন্তু ওকে বাইরে আনার মাত্র একটাই উপায় আছে।
মোর্শেদ ক্ষণিকের বিরতি টেনে পরিস্থিতি অত্যন্ত রহস্যঘন করে তুললো।
রাসেল অধৈর্য হয়ে বললো, উপায়টা বলেই ফেলুন না ছাই, কেন খামাখা টেনশনে রাখছেন?
উপায় মাত্র একটা–উষাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে হাফ ডেড্‌ করে ফেলা। সেক্ষেত্রে ওকে বাধ্য হয়েই কোন হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। আমরা এই সুযোগটা নিতে পারি।
মুকিত ভয়ে ভয়ে বললো, উষা আপা যদি সত্যি সত্যিই মরে যায়?
–ছিহ্‌ কি অলুক্ষণে কথা বলো। মরাটা কি অতো সহজ?
সাব্বির অভয় দিলো, এটা কোন সমস্যাই না। খান দশেক সিডাক্সিন খেলে বিপদের কোন আশঙ্কাই নেই। আসল সমস্যাটা আসছে আরো পরে। ধরুন উষা আপাকে যদি ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়, অথবা পিজিতে? ওসব জায়গা থেকে এরূগী চুরি করা বোধ হয় খুব সহজসাধ্য হবে না।

–উহু, ওসব কোথাও নেবে না। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি ওদের হাউস ফিজিশিয়ান ভদ্রলোক আল–জেদ্দা ক্লিনিকে কাজ করেন। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নেয়া চলে, উষাকে আল জেদ্দাতেই নিয়ে যাওয়া হবে। তোমরা কি বলো?
পরবর্তী দুঘন্টা ধরে প্রচুর জল্পনা–কল্পনা, তর্ক–বিতর্ক এবং অল্প–বিস্তর হাতাহাতির পর চমৎকার একটি পরিকল্পনা খাড়া করা হলো। নিঃসন্দেহে সেটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিপদজনক। সাফল্যের ব্যাপারেও কেউই নিশ্চিত নয়।

আট

সাঈদকে বাসা থেকে বের হতে দেখেই মুকিত ছুটে এলো।
–এই যে সাঈদ ভাই, শুনন।
–কি ব্যাপার মুকিত, কিছু বলবে?
–না, কি আর বলবো। তবে লীমা আপা আপনার কথা খুব বলেছিলেন।
–কে? মিস লীমা। মাই গুডনেস। উনি সেদিন সেই যে রেগে–মেগে চলে গেলেন আর তো এলেনই না। আমিও বুঝলে কিনা যোগাযোগ করতে ঠিক সাহস পেলাম না। তা ইয়ে, তুমি ওর ফোন নম্বর–টম্বর জানো নাকি?
–তা জানবো না কেন? আপনার দরকার?
–দরকার? না না, দরকার আবার কি। তবে ইয়ে দিলে ভালো হতো। তুমি ঠিক শুনেছো, উনি সত্যিই আমার কথা বলেছেন?
মুকিত ঠোঁট বাঁকিয়ে মধুর এক টুকরো হাসি দিলো। –সে কি একবার দুবার, দশ মিনিটে কম করে হলেও দশবার। উনি নির্ঘাত আপনার প্রেমে পড়ে গেছেন।
সাঈদ বোকার মত হাসতে লাগলো। –না না তা কি করে হয়। উনি কতো সুন্দরী মেয়ে, আর ইয়ে আমি ... ইয়ে ফোন নাম্বারটা দিতে পারো?
মুকিতের কাছ থেকে ফোন নাম্বার সংগ্রহ করে সাঈদ তক্ষুনিই বাসায় ছুটলো।
–কি হলো সাঈদ ভাই, কোথায় যাচ্ছিলেন–যাবেন না?
–যাবোতো বটেই। তবে বুঝলে কিনা কোন কাজেই দেরী করতে নেই। বলা তো যায় না, কে কখন প্রপোজাল দিয়ে বসে থাকে।
মুকিত হাসতে হাসতে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। কৌশলটি এতো চমৎকার খেটে যাবে, সে কল্পনাও করেনি। এখন লীমা আপা ঠিকঠাক মতো চালিয়ে যেতে পারলেই হয়।
লীমা প্রস্তুত হয়েই ছিলো। –হ্যালো।
–হ্যালো? মিস লীমা আছেন?
–বলছি।
আমি–মানে, উষার ভাই সাঈদ। সেদিন আপনার সাথে অনেকক্ষণ কথা হয়েছিলো। নিশ্চয় ভুলে যাননি।
লীমা একটি কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। –নাহ্, ভুলতে আর পারলাম কোথায়? আপনি তো সেদিনের পর একবারও আমার খোঁজ নিলেন না?
–কি করে নেবো বলুন, সাহসইতো পাচ্ছিলাম না। মা কেমন একটা সিনক্রিয়েট করে ফেললো ...
–আপনি বুঝি ভেবেছেন আমি সেই রাগে গাল ফুলিয়ে বসে আছি?
–মানে, আপনি কি রাগ করেন নি?
–ছিহ্, উনি গুরু জন, কি বলতে কি বলেছেন, তাইতে রাগ করাটা কি শোভা পায়?
–তাতো অবশ্যই। গুরু জনেরা অমন অনেক ফালতু কথা বলে।
–উহু, উনি কিন্তু মোটেও ফালতু কথা বলেন নি।
–তা যা বলেছেন, মা কখনো ফালতু কথা বলে না। কি ব্যাপার হাসছেন কেন?
–হাসছি। হাসবো কেন? গলাটা কেমন খুশ্ খুশ্ করছিলো তাই ... তা সিলেটে ফিরছেন কবে?
–সে তো এখনও অনেক বাকী। বড্ড বোর ফিল করছি ঢাকায়, বন্ধু–বান্ধবের সাথে কতো আর বক্ বক্ করা যায়?
–একটা বান্ধবী জুটিয়ে নিন না।
–বান্ধবী হঠাৎ করে আর কোথায় পাবো বলুন? তবে ইয়ে, আপনি যদি
–থামলেন কেন? বলুন।
–না মানে, আপনাকে আমার খুবই ভালো লেগেছে। আমাকে যদি আপনার নিতান্ত খারাপ না লেগে থাকে তবে
–তবে?
–ইয়ে মানে, কোথাও একটু দেখা সাক্ষাৎ

–আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে বলবো না, তবে খুব খারাপও লাগেনি। এক আধটা ডেটিং করলে মন্দ হয় না।
সাঈদের হার্ট বিট অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেলো, গলা অকারণে শুকিয়ে এলো, সে বিচলিত ভঙ্গিতে চুলে হাত বোলাতে শুরু করলো।
–কি হলো, কিছু বলছেন না কেন?
–আপনি সত্যিই আমার সাথে ডেটিং করবেন?
–নিশ্চয়।
–কবে?
–কাল।
–কখন?
–দুপুরে?
–কোথায়?
ইত্যাদি ইত্যাদি।

সন্ধ্যা ছটা।
উষা সিডাক্সিন দশটি পেয়ে হাতে যেন স্বর্গ পেলো। সে অশ্রু সিক্ত নয়নে রহিমার মাকে জড়িয়ে ধরলো।
–তুমি আমার যে উপকার করলে বুয়া, মায়ের পেটের বোন হলেও কেউ এতোটা করতো না।
রহিমার মাও কেঁদে ফেললো। –বিশ্বাস করেন, আফা, আমি এই কাম মোডেও করবার চাই নাই। কিন্তু ঐ পোলাগুলান শয়তানের লাহান আমারে মাইরা ফালানের ডর দ্যাহাইছে। আমি কি কর ম কন? মরণের ডর তো হগলেরই আছে।
–বুয়া, যদি বেঁচে থাকি তোমার কথা কোনদিন ভুলবো না। তোমার মতো এতো ভালো মানুষ আমি কখনো দেখিনি।
–আফা, আর যাই করেন মইরা যাইয়েন না। তাহলে হ্যারা আমারে কাইট্যা টুকরা টুকরা কইরা বুড়ীগঙ্গার পানিতে ভাসাই দিবো। আফনের দোহাই লাগে, আফা।
রহিমার মাকে আশ্বস্ত করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। তাকে একরকম ঠেলেই ঘর থেকে বের করে দেয় উষা। দরজা বন্ধ করে সে সম্মোহিত দৃষ্টিতে সিডাক্সিনগুলির দিকে তাকিয়ে রইলো। তার বুক টিপ টিপ করতে লাগলো, একধরনের উৎকণ্ঠিত আতঙ্ক ধীরে ধীরে চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো, সে মোর্শেদের নাম জপ করতে করতে বড়িগুলি উদরে চালান করে দিলো।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা।
সিদ্দিক বাসায় ফিরেই মেয়ের খোঁজ করলেন। –রহিমার মা, উষা কি ওর ঘরেই আছে?
–জ্বে। আমি একটু আগে গিয়া দেইখ্যা আইছি, ঘুমাইতেছে
–বলো কি? সাতটা বাজতে পারলো না এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো কেন? কিছু খেয়েছে?
–জ্বি না। হেরে তো কেউ খাওয়াইবার পারে না।
–এটা কোন কথা হলো? তুমি জলদি টেবিল সাজাও। আমি ওকে ডেকে আনছি।
রহিমার মা বিড় বিড় করে তার ক্ষুদ্র ভাণ্ডারে সঞ্চিত সমস্ত দর দগুলি পড়তে লাগলো, সব বুঝি ভেস্তে যায়। এইবার হারামী ছেলেগুলি তার বারোটা বাজাবে, কোন রক্ষা নাই।
সিদ্দিক দরজায় ধাক্কা দিলেন। –উষা, মা, দরজাটা খোল।
–দরজা? কোন দরজা বাবা?
–মানে? কি যা–তা বলছিস? তোর গলাটা এমন শোনাচ্ছে কেন? জলদি দরজা খোল।
–না বাবা, দরজাতো খোলা যাবে না। তোমাদের সাথে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই, আমি এখন অচিন পথের যাত্রী।
–কি পথের যাত্রী? কি হয়েছে তোর? এই উষা, দরজাটা খোল। তোর শরীরটা বোধ হয় ভাল নেই।
–আর শরীর? যার মন ভালো থাকে না তার শরীর ভালো থেকে কি হবে? তোমরা আমার সাথে বড় খারাপ ব্যবহার করলে বাবা। মরে গেলেও এ কথা ভুলব না। পেত্নী হয়ে এসে তোমাদের ঘাড় মটকাবো।
–মারে, আমাদের ভুল বুঝিস না। আমরা যে তোর ভালো চাই। আমরা তোকে কত ভালোবাসি, তুই বুঝিস না?

–কচু ভালোবাসো, কলা ভালোবাস। তোমরা কেন মোর্শেদের সাথে আমার বিয়ে দিলে না? আমিও তোমাদের ঐ পিতলা ঘুঘুটাকে বিয়ে করবো না। আমি মরে যাচ্ছি, বাবা। গুড বাই, টা ... টা ...
–উষা তোর দোহাই লাগে দরজাটা খোল। ও উষার মা, জলদি এসো, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেলো যে।
রাজিয়া উদভ্রান্ত পদক্ষেপে ছুটে এলেন। –কি ব্যাপার, কি হয়েছে?
–উষা কি সব বলছে শোন। ও উষা, মা, মাগো আমার কথা শোন ...
–আমি এখন সব শোনা–শুনির উর্দ্ধে চলে যাচ্ছি। কে যেন আমাকে ডাকছে–আয়, আয়। মাকে আমার টা–টা দিও। আহ্ কত্তো আরাম, বাবা, শরীর কেমন জুড়িয়ে যাচ্ছে ...
সিদ্দিক উচ্চঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন। –মারে, এ তুই কি করলি? সামান্য একটা ছেলের জন্য নিজের জীবনটা বিকিয়ে দিচ্ছিস?
–সামান্য বলে কিছু নেই, বাবা। এ শুধু দেখার ফের। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে, বাবা, তোমরা আমাকে বিরক্ত করো না ...
কান্নাকাটির আওয়াজ শুনে ছুটতে ছুটতে এলো রমজান। পরিস্থিতি বুঝতে তার খুব কম সময় লাগলো। সে অত্যন্ত প্রত্যুতপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়ে দরজা ভেঙ্গে ফেললো। বাঁধ ভাঙা জলের মতো হুড়মুড়িয়ে ভেতরে ঢুকলেন সিদ্দিক ও রাজিয়া। বিছানায় আলুলায়িত ভঙ্গিতে শুয়ে আছে উষা, তার চোখে আবিষ্ট দৃষ্টি, ঠোঁটের ফাঁকে দুগ্ধ ফেনিল ফ্যানারক্ত'র।

রাত সাড়ে আটটা।
ধানমন্ডি। ক্লিনিক আল–জেদ্দা। চারতালা বিশালদেহী দালান, সামনে সুপ্রশস্ত কম্পাউন্ড। কারু কার্যখচিত সুউচ্চ তোরণ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেই অভ্যর্থনা কক্ষ। দালানটি ফিট পনেরো দুরত্বে অবস্থিত। উপরে উঠার দুটি সিঁড়ি। প্রথমটি অভ্যর্থনা কক্ষের ঠিক মুখোমুখি। দ্বিতীয়টি অপর কোণে, এটির ব্যবহার কম। সিঁড়িটির পাশ ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে আছে আট ফুটি পাঁচিল, ওপাশে প্রাইভেট বাসা।

উষাকে দোতালায় তিন নম্বর কেবিনে এনে তোলা হয়েছে। আধ ঘন্টার মধ্যে পেট পরিস্কার করে ডাক্তাররা তার জীবনের আশংকা দূর করে দিয়েছেন, সে এখন নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে আছে। সিদ্দিক এবং রাজিয়া তার শয্যাপার্শ্বে গুটি–সুটি হয়ে বসে আছেন, তাদের চোখে মুখে প্রগাঢ় উদ্বেগের চিহ্ন। সাঈদকেও উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে, তবে সেটি উষার জন্য না লীমার জন্য সেই ব্যাপারে সে নিজেও তেমন নিশ্চিত নয়।

ঠিক পাশের কেবিনে গোপন শলাপরামর্শ চলছে।
–আজ রাতেই চিড়িয়া ভাগিয়ে নিলে কেমন হয়, মোর্শেদ ভাই?
মোর্শেদ কড়া চোখে রাসেলকে নিরীক্ষণ করলো। –হ্যাঁ, চিড়িয়া ভাগাতে গিয়ে আমরা সব কটা হাজতে চালান হয়ে যাই আর কি। ওসব আবোল তাবোল চিন্তা বাদ দাও, সব কিছু প্ল্যান মতো করতে হবে।
–কিন্তু ধর ন, উষা আপাকে যদি কাল সকালেই বাসায় নিয়ে যায়?
–নিয়ে গেলেই হলো? ইয়ার্কি নাকি।
সাব্বির গম্ভীরভাবে বললো, উহু মোর্শেদ ভাই, এটা কিন্তু একটা সমস্যা। গোয়েন্দা চাচীকে মোটেও বিশ্বাস নেই। এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা করা উচিত ছিলো।
মোর্শেদ দ্বিধায় পড়লো। –হাজার হাজার সমস্যার ভীড়ে এটার কথাতো তখন মনেই পড়েনি, জলদি একটা বুদ্ধি বের করো।
রণক বললো, উপায় একটাই, যেভাবেই হোক উষা আপাকে কালকের দিনটা এখানে আটকিয়ে রাখতে হবে।
সেটাতো আমিও বুঝতে পারছি, বাবা। কিন্তু আটকিয়ে রাখবোটা কিভাবে? দড়ি দিয়ে তো আর বেঁধে রাখতে পারবো না।
রণক মিটি মিটি হাসতে লাগলো। –সেই বুদ্ধিও আছে।
অমন ফাজিলের মতো হেসো না। –বুদ্ধি–টুদ্ধি কিছু থাকলে ঝট্‌পট্ বলে ফেলো। টেনশনে আমার মাথা বিগড়ে যাচ্ছে।
–ডাক্তার সাহেবকে চেপে ধরলেই হয়।
–মানে। তোমার কি মাথা খারাপ? ওদের হাউস ফিজিশিয়ান হয়ে ভদ্রলোক আমাদের কথায় রাজী হতে যাবেন কোন দুঃখে?
–সে দাওয়াইও আছে।
–যেমন?

রণক অন্যান্যদের দিকে তাকিয়ে ক্রমাগত চোখ টিপতে লাগলো। মোর্শেদের কিছুই বুঝতে বাকী থাকলো না। সে সস্ত্রস্থ ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো। –খবর্দার, কোন রকম বিটলামী নয়। উষার এখন যা অবস্থা তাতে এমনিতেই ওকে এখান থেকে দিন দুই এর আগে বাসায় নিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না অন্ত ত না নিলেই আমাদের জন্য ভালো।
–এইটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে। কিন্তু তাই বলে ডাক্তারদের ছুরি–চাকুর ভয় দেখিয়ে বেড়ানোর কোন মানে নেই। এই সমস্ত কাণ্ড আমি মোটেই সহ্য করবো না।
বিতর্ক এখানেই শেষ হলো না। তবে কোন সিদ্ধান্তে ও পৌঁছানো গেলো না। সেটি স্বাভাবিক, এরা কখনো কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না।

পরদিন সকালে মুকিত উষাকে দেখতে এলো। সিদ্দিক তাকে দেখে খুশী হলেন। –এসো বাবা এসো, তোমার বাবা মা কেউ এলেন না?
–জ্বি, উনারা সবাই আসছেন। আমি একটু আগে চলে এলাম। কাল রাতেই আসতাম কিন্তু ... এই পর্যায়ে তাকে থেমে যেতে হলো, কারণ কাল রাতে তার আসার কোন উপায় ছিলো না, সে তখন রাসেলদের সাথে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো।
রাজিয়া বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন, তার চোখ জোড়া ঘোলাটে রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। তিনি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে মুকিতকে ছিন্নভিন্ন করে ফেললেন। –কি হলো, থামলে কেন? কাল রাতে কেন আসো নি?
–জ্বি, আমি বাসায় ফিরেছিলাম অনেক রাত করে। তখন বাবা–মা আর আসতে দিলেন না। বললেন কাল সকালে যাস।
–কেন, অনেক রাতে বাসায় ফিরেছিলে কেন? কোথায় ছিলে ততক্ষণ? কি হলো, চুপ করে আছো কেন? উত্তর দাও।
মুকিতের হাতের তালু ঘামতে শুরু করলো। কানের লতিতেও ঈষৎ উষ্ণতার সৃষ্টি হলো। –জ্বি মানে, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছিলাম।
–কারা তারা? কোথায় থাকে? কোথায় আড্ডা দিচ্ছিলে?
মুকিত তোতলাতে লাগলো। –দে দেখুন এমন হবে জানলে আমি কক্ষনো উ–উষা আপাকে দেখতে আসতাম না।
–তা, আসবে কেন? চোরের মন পুলিশ পুলিশ বলে একটা কথা আছে না। ভেবেছিলে গোবেচারা মুখ করে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেই আমরা গলে একেবারে পানি হয়ে যাবো? তোমাকে চিনতে আমার একটুও বাকী নেই। বাঁদরের হাঁড় কোথাকার। ঐ বদমায়েশ ছেলেগুলোর সাথে তোমার কিসের সম্পর্ক? আমার তো সন্দেহ হচ্ছে ওষুধগুলো তুমিই যোগান দিয়েছো, নইলে উষা ওসব কোথায় পাবে? তোমার নামে আমি থানায় কেস দেবো, চৌদ্দ বছর জেলের ঘাটি টানিয়ে ছাড়বো। ঘুঘু দেখেছো ফাঁদ দেখোনি ...
উষা করুণস্বরে বললো, মা, তুমি মুকিতকে অপমান করো না। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। ওর মতো ভালো ছেলে হয় না।
–তুই চুপ কর। তোকে আর বড় বড় কথা বলতে হবে না। বেহায়া মেয়ে কোথাকার, লজ্জা করে না এসব করতে? ধাড়ী বয়সে এমন একটা কেলেংকারী বাঁধালি, মানুষের কাছে মুখ দেখাবি কি করে?
–মা, তুমি আমাকে খামোখা বকছো কেন? আমার কিন্তু কান্না পাচ্ছে।
–কান্না পেলে কাঁদ, বেশি ভজর ভজর করিস না। মুকিত তুমি বাইরে যাও। তোমার মতো কুলাঙ্গারের মুখ দেখাও পাপ। যাও, ভাগো।
মুকিত এদিক ওদিক কিছুক্ষণ হাঁটাহাটি করে এক ফাঁকে চার নম্বর কেবিনে শরীর গলিয়ে দিলো। ঘটনা শুনে রাসেল দাঁতে দাঁত ঘষলো। রোসো, আর কটা ঘন্টা থাক, তারপর দেখিয়ে দেবো কত ধানে কত চাল।
সাঈদ টাই–ট্রং এ পৌঁছালো ঠিক বারোটায়। তার চিত্ত লীমার দর্শন আকাঙ্খায় অতিরিক্তমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সে মনে মনে কথার বিনুনি গাঁথছে। মেয়েটি যে তার কাছে ধরা দেবে এ ব্যাপারে সে মোটেই সন্দিহান নয়, এখন শুধু নিজেকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করার অপেক্ষা মাত্র।

সে দুটো পর্যন্ত অপেক্ষা করলো, কিন্তু লীমা এলো না। গভীর হতাশায় তার আঁখি অশ্রু সিক্ত হয়ে পড়লো, মেয়েরা কেন তার সাথেই বার বার ছলনা করে?
দুপুর দেড়টা।
রাসেল এবং রণক উঠলো।

–আমরা এবার যাই, মোর্শেদ ভাই। গাড়ি নিয়ে জায়গা মতো থাকবো। এদিকটা কিন্তু আপনাদেরকেই সামলাতে হবে। রাসেল স্বভাব সুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে বললো।

মোর্শেদ ঘেমে নেয়ে উঠেছে। আগামী আধ ঘন্টার মধ্যেই ঘটতে শুরু করবে ঘটনা। কি হতে কি হয়ে যায়, তার কোন ঠিক নেই। সে যথেষ্ট ভয়ে রয়েছে। ঠিক আছে যাও, দেখি আমরা কতদূর কি করতে পারি।
–ওসব বুঝি না। যেভাবেই হোক উষা আপাকে দেয়াল পার করে পাশের বাড়িতে চালান করে দেবেন। বাকীটা আমরা ম্যানেজ করে নেবো।
–চেষ্টাতো করবই। এখন কোন গোলমাল না হলেই হয়।
ওসব চেষ্টা–ফেষ্টা বুঝি না। একশনে নেমে এমন দেখি–দেখি করলে চলে না। মজনু এদিকের দায়িত্ব তোর। মোর্শেদ ভাইয়ের উপর কোন ভরসা নেই। সে ফিল্ড মার্শালদের মতো গম্ভীর মুখে সবাইকে পর্যবেক্ষণ করলো। চল রণক।
তারা দরজা খুলে উকি দিয়ে দেখে নিলো করিডোরে শত্র পক্ষীয় কোন গোয়েন্দা আছে কিনা, অতঃপর পথ পরিস্কার বিধায় সুড়ুৎ করে সরে পড়লো।
মোর্শেদ বিড় বিড়িয়ে উঠলো, দেখো, গোলমাল যদি কেউ পাকায় তো ওরাই পাকাবে। হয়তো আমার সাধের গাড়িটাকে সোজা খালের মধ্যে নিয়ে ফেলবে। ওদের উপর কোন ভরসা নেই।
সে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে লাগলো। শেষ পর্যন্ত শিলও গেলো নোড়াও গেলো অবস্থা না হয়।

দুপুর পৌনে দুটো।
ডা. আব্দুলাহ করিম রাউণ্ডে বেরিয়েছেন। তিনি শুনেছেন চার নাম্বার কেবিনে একটি অদ্ভুৎ রোগী এসেছে। লোকটি সম্ভবত মানষিক রোগে ভুগছে, তার ধারণা হাসপাতালে না থাকলে সে মারা যাবে। এই লোকটিকে নিয়ে ইতিমধ্যেই ডাক্তারদের ভেতরে বেশ রসিকতার সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি কেবিনে ঢুকে বেশ হক্চকিয়ে গেলেন। মাঝারী স্বাস্থ্যের একটি লোক বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে এবং পাঁচটি কিশোর বয়সী ছেলে প্রবল দুশ্চিন্তা ভারাক্রান্ত বদনে সেদিক তাকিয়ে আছে। তিনি বহুকষ্টে এক টুকরো হাসি উপহার দিলেন।
–কি ব্যাপার, তোমাদের রোগীর অবস্থা কি?

মজনু ফিসফিসিয়ে বললো, ভালই মনে হচ্ছে ডাক্তার আঙ্কেল। এখানে বোধ হয় ওর তেমন ভালো লাগছে না। কাল সকালেই সম্ভবত বাসায় নিয়ে যাওয়া যাবে। এবার একটা মাথার ডাক্তারকে না দেখালেই নয়।
–ইনি তোমার ভাই হন?
–জ্বি। আমরা চার ভাই, বাবা মা নেই। অন্য ভাইরা বাইরে চলে গেছে। বড় ভাইয়াকে নিয়ে আমি বড় বিপদে পড়েছি। অন্য সব কিছুই স্বাভাবিক, কোন অসুখ–বিসুখও নেই, কিন্তু এই ব্যাপারটা ... আপনি নিশ্চয় শুনেছেন?

–শুনেছি বাবা। তবে তুমি বিশেষ দুশ্চিন্তা করো না। আমি একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে কথা বলবো। ভদ্রলোক আমার পরিচিত, ওর চিকিৎসার কোন অসুবিধা হবে না। তিনি দ্রুত পায়ে কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। মানুষের ওই রকম অদ্ভুত মানসিক অসুখের কথা তিনি আগে কখনও শোনেননি, তার বেশ হাসি পাচ্ছে। হাসিটিকে সামাল দিতে আধ–মিনিট গেলো। এবার তিনি তিন নম্বর কেবিনে ঢুকলেন।
রাজিয়া তাকে দেখে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। আসুন ডাক্তার সাহেব, উষা আজ অনেকটা ভালো। ওকে বোধ হয় এবার বাসায় নেয়া যায়।
উষা ক্ষীণস্বরে আপত্তি জানালো, না না, আমি বাসায় যাবো না।
–কি ছেলে মানুষের মতো কথা বলছিস? সারা জীবন হাসপাতালেই কাটাবি নাকি?
–ঐ হাজতেই ঢোকার চেয়ে সেও ভালো।
রাজিয়া অত্যন্ত অপ্রতিহত হয়ে পড়লেন। আব্দুলাহ একটি প্রাণ খোলা হাসি দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেবার চেষ্টা করলেন।

–ছিহ্ উষা, এমন করে বলতে নেই। তোমার বাবা–মা দুঃখ পাচ্ছেন। এবার বলো, শরীরটা কেমন লাগছে? খুব হালকা হালকা নিশ্চয়।
–জ্বি না, খুব ভারী ভারী লাগছে। মনে হচ্ছে এক্ষুণি বমি হবে। আমি বোধ হয় সত্যি সত্যিই মরে যাচ্ছি।
সিদ্দিক কর্ণ গলায় বললেন, মারে, এমন কথা বলিস না। তুই মরে গেলে আমরা কি নিয়ে বাঁচবো।
–কেন বাবা, তোমাদের আত্মসম্মান নিয়ে।
সিদ্দিক শুকনো মুখে আবদুলাহর দিকে ফিরলেন। –মি. আবদুলাহ, যেভাবে হোক ওকে ভালো করে দিন। এই বয়সে সম্মান হারানোর দুঃখ সইতে পারবো না।
–আরে, আপনি অযথা নার্ভাস হচ্ছেন। উষা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।
–না, আমি মোটেই সুস্থ নই।
আব্দুলাহ হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলেন। –তোমার দেখি পাশের কেবিনের রোগীটার মতো অবস্থা হয়েছে। বুঝলেন মিসেস সিদ্দিক, এক ইয়ংম্যানের ধারণা হয়েছে হাসপাতালে না থাকলে সে মারা যাবে, কি বিপদ দেখুন দেখি। হাঃ হাঃ ...
রাজিয়া ভ্রূ কুঁচি করলেন। –ইয়ংম্যান? বয়স কত? কেমন দেখতে? কালো মতন? কবে ভর্তি হয়েছে?
উষা তটস্থ হয়ে উঠলো। –মা, তুমি কানের পাশে এতো চেচামেচি করো না তো। আমার হার্ট এটাক হয়ে যাবে।
হলে হবে। ডাক্তার সাহেব, ঠিক করে বলুন তো ছেলেটা কেমন দেখতে? ঠোঁট দুটো মোটা, নাকটা খাড়া, লম্বা চুল, ঠিকতো?
–না মানে হাঁ, মানে আমি তো ওকে দেখিনি। গিয়ে দেখলাম চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। পাগল ছাগলের কাণ্ড বুঝলেন কিনা, হাঃ হাঃ ...
রাজিয়া সিদ্দিকের দিকে ফিরলেন। –গিয়ে একবার দেখে আসবো নাকি? সেই শয়তানটাওতো হতে পারে।
–ধ্যাৎ কি যা তা বলো।
উষা ককিয়ে উঠলো, মা, তুমি এখন আমার পাশ থেকে না উঠলে আমি মাথা কুটে মরবো।
–তুই মরতে যাবি কোন দুঃখে? মরবো তো আমি। খুব একটা খেলা দেখালি যা হোক, বদমাশ মেয়ে কোথাকার। এই, তুমি এমন বোকার মত বসে আছো কেন? গিয়ে একটু দেখেই এসো না। এই দুনিয়ায় কোন কিছুই অসম্ভব না।
সিদ্দিক ইতস্তত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। –যাবো?
–যাও বলছি।
–না বাবা, তুমি যাবে না।
–আমি বলছি তুমি যাবে।
–হাঃ হাঃ ... বেশ দোটানায় পড়া গেছে কি বলেন সিদ্দিক সাহেব?
–ইয়ে তাইতো মনে হচ্ছে ...
বাইরে একটি প্রচণ্ড হট্টগোলের শব্দ শোনা গেল। আব্দুলাহ আঁতকে উঠলেন। –এই সেরেছে, সেই ছোড়াগুলো আবার গোলমাল পাকালো নাকি?
রাজিয়া ভীত–সন্ত্রস্থ হয়ে পড়লেন। –কোন ছোঁড়াগুলো?
–থাকে কোথায়? ওরা কি প্রায়ই গোলমাল পাকায়? এসব কোন প্যান–টেলান না তো?
–প্যান? কিসের প্যান? আপনি খামোখা উত্তেজিত হবেন না মিসেস সিদ্দিক। আমি দেখছি, কি ব্যাপার। এদের জ্বালায় একটু নিশ্চিন্তে থাকার উপায় নেই। সিদ্দিক সাহেব, আপনিও চলুন।
–তাই চলুন।
–আরে না, তুমি আবার গোলমালের মধ্যে যাবে কেন?
গোলমালের মধ্যে যাচ্ছি তা কে বললো? ঘটনাটা একটু দেখে আসি। তুমি বসো। তিনি ডাক্তারকে অনুসরণ করে বিপরীত দিকের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন।
নীচের কম্পাউণ্ডে তুমুল লড়াই চলছে। দুদল কিশোর বয়সী ছেলে রড হকিষ্টিক সহ অন্যান্য সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে পরস্পর পরস্পরকে ধাওয়া–পাল্টা ধাওয়া করছে, উচ্চস্বরে খিস্তি খেউড় করছে এবং সামনে ধাতব যা কিছুই পাচ্ছে তার উপর একাধিকবার আঘাত করে রণ দামামা বাজাচ্ছে, তাদের তীব্র রণ হুংকারে এবং প্রবল বীরত্বপূর্ণ আস্ফালনে বিশাল দর–দালানটি পর্যন্ত প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে।
মোর্শেদ লাফিয়ে বিছানা ছাড়লো। –মুকিত দৌড়াও উষার মাকে সরানোর দায়িত্ব তোমার। জলদি কর।

মুকিত ছুটলো। রাজিয়া তাকে দেখেই দুচোখ বিস্ফোরিত করে ফেললেন। –আরে মুকিত তুমি এখানে?
মুকিত কিচির মিচির করে উঠলো, জ্বি চাচী একটা খবর দিতে এলাম। –সাঈদ ভাইকে ওরা খুব মারছে।
–কাকে? সাঈদকে? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। সাঈদকে কেন মারতে যাবে ওরা? সাঈদ কি করেছে?
–তা জানি না চাচী। কিন্তু নিজের চোখে দেখলাম সাঈদ ভাইকে মেরে নাক ভেঙে দিয়েছে।
রাজিয়া উদভ্রান্তের মতো ছুটলেন। –কি সাংঘাতিক কাণ্ড। আমার ছেলের নাক ভাঙে কার এতো বড় সাহস?
উষা ঝট করে উঠে দাঁড়ালো। –মুকিত মোর্শেদ কোথায়?
–পাশের কেবিনে। তাড়াতাড়ি আসুন উষা আপা। হাতে সময় খুব কম।
উষা এলো মেলো পায়ে করিডোরে এসে দাঁড়ালো। মোর্শেদ ছুটে এসে তাকে প্রায় কোলে তুলে নিলো। –একদম সময় নেই উষা। জলদি চলো। সে উষাকে নিয়ে প্যাঁচানো করিডোর ধরে পেছনের সিঁড়িটির দিকে এগুলো। মজনু উৎকণ্ঠিত স্বরে বললো, তাড়াতাড়ি যান মোর্শেদ ভাই। দেয়ালের পাশে একটা চেয়ার রাখা আছে, উষা আপাকে পার করতে অসুবিধা হবে না। আমরা এদিকটা সামলাচ্ছি? জলদি করুন।
উষা মোটেই হাঁটতে পারছে না, তার মাথা ভন্ ভন্ করে ঘুরছে। সে ক্ষীণ স্বরে বললো, মোর্শেদ আমি পারছি না। আমার বমি আসছে।
–পিজ উষা, আর একটু সহ্য করো। মাত্র দুমিনিট। তারপর যতো খুশী বমি করো। সে উষাকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলো।
চেয়ারটিকে জায়গা মতই পাওয়া গেলো। মোর্শেদ উষাকে চেয়ারের উপর তুলে দিয়ে নিজে এক লাফে পাঁচিলে উঠে পড়লো। উষা তার দুহাত চেপে ধরলো। –আমি উঠতে পারছি না, মোর্শেদ। আমাকে তুলে নাও।
মোর্শেদ তার শক্তিশালী বাহু দিয়ে উষাকে টেনে দেয়ালের উপর তুলে ফেললো। দোতালায় দাঁড়িয়ে মারপিট দেখছিলো জনৈক নার্স, হঠাৎ তার চোখ পড়লো এদিকে। সে দম নিতে ভুলে গেলো। রোগী পালালো, রোগী। ধরো–এই দারোয়ান, ওদেরকে ধরো।
উষা কটমট করে তাকালো। –চোপ। লাথি মেরে বত্রিশ পাটি দাঁত ভেঙে দেবো।
–এই, কেউ ওদেরকে ধরো। পালিয়ে গেলো তো।
–এক চড়ে তোর বাবার নাম ভুলিয়ে ছাড়বো আমি, চেঁচাও মাত।
রাসেল এবং রণক পাশের বাড়ির গেট খুলে ছুটে এলো। উষা আপা জলদি নামুন। পুলিশ আসছে।
মোর্শেদ উষাকে ঝুলিয়ে ধরলো, রাসেল এবং রণক মটকা মেরে তাকে নীচে নামিয়ে নিলো। মোর্শেদও লাফ দিয়ে নামলো। ঝাঁকিতে তার প্যান্টের পেছনটা ফেড়ে গেলো। সে হাত দিয়ে স্থানটি ঢাকার কসরৎ করতে লাগলো। –কি বিপদ দেখো দেখি, রাসেল। প্যান্টটা দুফাঁক হয়ে গেলো যে।
–আরে রাখুন আপনার প্যান্ট। উষা আপাকে নিয়ে জলদি গাড়িতে গিয়ে উঠুন। আমি এদিকে কুত্তাটাকে সামলাই। এই বাড়িতে একটা কুত্তার বাচ্চাও আছে সে খবরতো জানতাম না।
সে কোমর থেকে বেল্ট খুলে শ্বেতধবল বিদেশী ক্ষুদ্রাকার কুকুরটির বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হলো। মোর্শেদ এবং রণক উষাকে নিয়ে গলি পথে নামলো। মসৃন গতিতে একটি টয়োটা এগিয়ে এলো। শাহেদ, চেচাঁলো, জলদি উঠুন মোর্শেদ ভাই, পুলিশ আসছে। ধরতে পারলে ফাঁসী।
উষা ফোঁস করে উঠলো, কিসের ফাঁসী? ইয়ার্কি পেয়েছে নাকি? আমাকে যে জোর করে আটকিয়ে রেখেছিলো, সেটা দোষের না?
মোর্শেদ দ্রুত হাতে তাকে ব্যাকসীটে বসিয়ে দিয়ে নিজেও উঠে পড়লো। রণক তীব্রস্বরে শীষ বাজালো। রাসেল পড়ি–মড়ি করে দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠলো। বাবারে, কুকুরতো নয় যেন সাক্ষাৎ শয়তান। আঁচড়িয়ে আমার বাপ–দাদার নাম পর্যন্ত ভুলিয়ে ছেড়েছে। বাড়ির লোকগুলোও এক একটা জানোয়ার, হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। শালাদের আমি দেখে নেবো...

শাহেদ মোহাম্মদপুরের দিকে গাড়ি ছোটালো। তারা আসাদ গেট এবং ফার্মগেট হয়ে মহাখালীর দিকে চললো। সেখানে রাসেলদের পরিচিত একজন কাজী রয়েছেন।

কাজী ভদ্রলোকের নাম মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন কোরায়শী, তার চেহারাখানিতে নুরানীর ঝিলিক রয়েছে, মাথায় টুপী, চিবুকে চিকন ধারার একগুচ্ছ দাঁড়ি, বেরসিকজনেরা যাকে একটি বিশেষ প্রাণীর সাথে সম্পর্কিত করে ফেলেন।

ভদ্রলোক প্রস্তাব শুনেই ভড়কে গেলেন। –ন, ন, আই ন' ফাইত্যাম। হুলিশে আর চৌদ্দ গোষ্ঠির নাম ভুলাইয়া দিয়ম, আঁরে মাফ্ কইরতন আফনেরা, আঁই এই কাজ ন' ফাইত্যা।
রাসেল গর্জে উঠলো, পারবেন না মানে, ফাজলামী করার আর জায়গা পান না? পাত্র–পাত্রী দুজনই প্রাপ্ত বয়স্ক। বিয়েতে দুজনারই মত আছে তাহলে আপনার বিয়ে পড়াতে আপত্তি কিসের?

কোরায়শী কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, আফনেরা আঁরে মাফ করেন। ঈয়ার আগে এই কাম্ কইরা আঁর বংশ ধরি টানাটানি হঁড়ি গেছ্িল, আঁই আর হেই ঝামেলায় যাইতন্ না।
উষা দুর্বল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলো, তার বিশেষ স্বস্তি বোধ হচ্ছে না। পা দুখানিকে অন্য কারো মনে হচ্ছে। সে জলন্ত দৃষ্টিতে কাজীকে ভস্ম করলো –কিসের যাইতন ন' এ্যা। মিয়া বিবি রাজী তো কেয়া করেগা কাজী? আপনি বিয়ে পড়ান।
–ন' ন', আঁই ফাইতম্ ন। আফনের বাপ–মা আঁর নামে কোর্টে কেস ঠুকি দিলে আর কি অবস্থা অইবো কন? আঁই কই যামু? আঁর তো চৌদ্দ বছর জেল হই যাইবো।
উষা একটি বিশ্রী কাণ্ড ঘটিয়ে ফেললো। সে কাজী সাহেবের চুলের অংশ বিশেষ অধিকার করে হুমকি দিলো, বিয়ে পড়াবেন কিনা বলুন? নইলে টেনে চুল ছিড়ে ফেলবো।
–হা খোদা, ইয়া কি বিপদে আঁরে ফালাইলা? আঁর এই ফঞ্চাশ বছর জীবনে কেউ আঁর চুল ধরি টান নাই। আম্মাগো বড় বেদনা লাগে। আন্নের দোহাই লাগে, ছাইড়্যা দ্যান।
–পড়াবেন বিয়ে?
হরামু, হরামু। আই আফনেগো হগলের বিয়া হরাই দিমু। আন্নে আর চুলডা ছাড়ি দ্যান গো।
পরবর্তী বিশ মিনিটের মধ্যে মোর্শেদের চারজন বন্ধু এবং লীমা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেলো। কাজী সাহেব উপযুক্ত সাক্ষী সাবুদ নিয়ে তার কর্তব্য সম্পাদন করে পরিত্রাণের নিঃশ্বাস ছাড়লেন।
উষা পরম ক্লান্তিতে মোর্শেদের গায়ের উপর ঢলে পড়লো।
–মোর্শেদ, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।
–আর কোন ভয় নেই। তুমি ঘুমাও। মোর্শেদ তাকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটের উপর আলতো করে একটি চুম্বন করলো।
কাজী সাহেব চোখ বুঝলেন। –নাউজুবিল্লাহ। আস্তাগফির লাহ।

নয়

সুত্রাপুর থানা।
সাব ইন্সপেক্টর রসুল আলী বেশ নিস্পৃহ ভাবভঙ্গি নিয়ে দম্পত্তিটিকে পর্যবেক্ষণ করলো। দুজনই প্রগাঢ় উত্তেজনায় রক্তিম হয়ে উঠেছেন, চোখের তারায় রাশি রাশি উদ্বেগ, কণ্ঠে কথার ফুলঝুরি, সেসবের কোন মাথা মুণ্ডুই রসুলের মাথায় ঢুকছে না।
–তারপর আপনারা কি যেন বলছিলেন?
সিদ্দিক এবং রাজিয়া প্রায় একই সাথে তাদের দীর্ঘ অভিযোগখানি শেষ করে এনেছিলেন, সেই মুহূর্তে এই ধরনের নির্বিকার প্রশ্ন শুনে দুজনই মুহূর্তের জন্য নির্বাক হয়ে গেলেন।

রসুল নিস্পৃহ কণ্ঠে তাগাদা দিলো, কি হলো চুপ করে গেলেন যে। আপনাদের অভিযোগ টবিযোগ কিছু থাকলে তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন। আমার অন্য কাজ আছে।
সিদ্দিক এবং রাজিয়া সমস্বরে গোড়া থেকে শুরু করলেন। রসুল হাত তুললো।
–একজন একজন। ওয়ান এট এ টাইম।
রাজিয়া, তুমিই বলো।
–না, তুমিই বলো।
–তোমার মেয়ে, তুমিই বলো।
–আমার মেয়ে মানে! তুমি ওর কেউ নও?
–আমি কি তাই বলেছি।
রসুল খুব বিপদে পড়ল। –ব্যাপার কি বলুন তো? আপনাদের কি মেয়ে টেয়ে হারিয়ে গেছে নাকি?
–জ্বি না, চুরি গেছে। রাজিয়া থম্‌থমে গলায় বললেন।
–আচ্ছা। বয়স কত? কথাবার্তা বলতে পারে? কি রঙের ফ্রক পরেছিলো? কোথা থেকে চুরি হয়েছে?
–জ্বি।
–এতো আশ্চর্য হচ্ছেন কেন? মেয়েটাকে উদ্ধার করতে গেলে এই সমস্ত তথ্য আমাদের জানা লাগবে না?
সিদ্দিক ফ্যাকাশে মুখে বললেন, আপনি যা ভাবছেন ঘটনা তা নয়। আমার মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। এক কুৎসিৎ কুলাঙ্গার ওকে ছিনতাই করেছে।
–তাই নাকি! কোথা থেকে কিভাবে?
–ক্লিনিক আল জেদ্দা থেকে, প্রকাশ্য দিবালোকে।
–কে করেছে? তাকে চেনেন আপনারা?
–চিনি না মানে। বাপ–ব্যাটা দুটোকেই চিনি। জব্বার আলীকে নিশ্চয় চেনেন, ও আর ওর অকালকুস্মাণ্ড ছেলে মিলে আমার সোনার টুকরো মেয়েটাকে ছিনতাই করেছে। আপনি যেভাবে হোক আমার মেয়েকে উদ্ধার করে দিন।
রাজিয়া ফুঁসে উঠলেন না। –শুধু মেয়ে উদ্ধার করলেই হবে না, ঐ বাপ–ব্যাটা দুটোকে ফাঁসীতে ঝোলাতে হবে, নইলে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে দেবো আমি। কত বড় সাহস, আমার মেয়েকে হাইজ্যাক করে।
রসুল বিরক্ত হলো। –দেখুন, আমরা পুলিশ, বিচারক নই। কাউকে ফাঁসীতে ঝোলানো আমাদের কাজ নয়।
–আপনাকে ঝোলাতে বলেছে কে? আপনি শুধু ঐ শয়তান দুটোকে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে আসুন। ঝোলানোর দায়িত্ব আমার।
রসুল সিদ্ধান্ত নিলো, এদেরকে অধিক লাই দেয়া ঠিক হবে না, তাতে তার নিজের মস্তকেও গোলমাল দেখা দিতে পারে। সে অত্যধিক গাম্ভীর্য নিয়ে বললো, আপনারা কি কোন কেস ফাইল করবেন?
–নিশ্চয়, নিশ্চয়।
–কার নামে?
–জব্বার আলী এবং মোর্শেদের নামে।
–অভিযোগ?
–আমাদের মেয়ে উষাকে জলজ্যান্ত সূর্যের আলোয় হাজার হাজার মানুষের চোখের সামনে হাইজ্যাক করা হয়েছে এবং লুকিয়ে রাখা হয়েছে।
রসুল যথাযথ নিয়ম অনুসারে কেস ফাইল করে ফেললো।

–ঠিক আছে, আপনারা এবার যান। বাকীটা আমরা দেখবো।
–জ্বি না, আমরা যাবো না।
–মানে!
–আপনি যতক্ষন না ঐ শয়তানের চ্যালা দুটোকে আলুর বস্তার মতো চ্যাংদোলা করে থানায় নিয়ে আসছেন ততক্ষণ আমরা এখানে ঠায় বসে থাকবো।
রসুল বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে রাজিয়া বেগমকে পরখ করলো।
–আপনাদেরকে আমি এক মিনিট সময় দিচ্ছি, এর মধ্যেই বিদায় না নিলে সোজা হাজতে ঢুকিয়ে দেবো! যান, জলদি যান। আপনার মেয়ে যাতে সুস্থদেহে ফিরে আসে সেটা দেখার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। কোন চিন্তা করবেন না। সোজা বাড়ি ফিরে যান।

সিদ্দিক এবং রাজিয়া হুমকির মুখে থানার চৌহদ্দি ছাড়লেন।

রসুল যখন জব্বার আলীর বাসায় পৌঁছলো তখন সেখানে রীতিমতো উৎসব বসে গেছে। বাড়ির ভেতরে প্রচুর জনসমাগম, সবার মুখই হাসি–হাসি, পরিতৃপ্ত কোথাও কোন অপরাধ বোধের সামান্যতম চিহ্নও নেই। রসুল যথেষ্ট আশ্চর্য হলো। সিদ্দিক সাহেবের কথা সে আদৌ বিশ্বাস করেনি, ধারণা করেছিলো এর মধ্যে অন্য কোন ঘাপলা আছে, কারণ জব্বার আলী শুধু তার পরিচিত তাইই নয়, মোর্শেদের সাথেও তার কিয়ৎ পরিমাণ পরিচিতি আছে, আর যাই হোক নারী ছিনতাইয়ের মতো জঘন্য কাজ এদের দ্বারা ঘটা সম্ভব নয়। কিন্তু তা হলেও এই উৎসব মুখরতার কারণ তার কাছে আদৌ পরিস্কার হলো না। সে কনষ্টেবল দুজনকে বাইরে দাঁড়াতে বলে চশমা পরা একটি ছেলের কাছে জব্বার আলীর খোঁজ করলো। চশমাধারী নির্বাক দৃষ্টিতে তার ইউনিফর্মের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো, ছেলেটির চোখে মুখে মুহূর্তের জন্য ভয় এবং উদ্বেগের চিহ্ন খেলে গেলো, সে ঘন ঘন চশমায় হাত দিতে লাগলো এবং বড় বড় ঢোক গিলতে শুরু করলো।

রসুল নরম গলায় বললো, জব্বার সাহেবকে ডাকো। ভয়ের কিছু নেই। উনি আমাকে চেনেন।
রণক চিকন গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, রাসেল, মজনু, মোর্শেদ ভাই পুলিশ!
এই সামান্য চিৎকারটিই অসামান্য কাজ করলো, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেলো। এতোগুলি মানুষের নীরব, কৌতুহলী দৃষ্টির সামনে রসুল খুবই অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করলো। সে বোকার মতো হাসতে হাসতে এদিক সেদিক তাকাতে লাগলো, জব্বার সাহেবকে একটু চাচ্ছিলাম।

জব্বার খবর পেয়েই ছুটে এলেন। –আরে রসুল সাহেব দেহী, কি সৌভাগ্য আমার! আহেন, আহেন, বাইরে খাড়াইয়া রইছেন ক্যান? আজ আমার বড় আনন্দের দিন। শালার সিদ্দিক ছাগলার মাইয়া হইলো আমার ঘরের বউ, বিশ্বাস করবার পারেন ... হাঃ হাঃ বড় সুখ রে ভাই, আরে সাহেব ভেতরে আইসা বহেন, এতো শরম ক্যান?
রসুল খুক্ খুক্ করে কেশে নিজেকে প্রস্তুত করে নেবার চেষ্টা করলো। সে জানে সে যা করতে এসেছে তাতে সফলকাম হওয়া খুব সহজসাধ্য হবে না। এই লোকটি যেমন প্রাণখোলা তেমনি গোয়ার।
জব্বার সাহেব, আপনার এবং মোর্শেদের নামে একটি কেস করা হয়েছে, অভিযোগ নারী অপহরণ। এই ব্যাপারে সরেজমিনে তদন্ত করতে এসেছি আমি। আপনারা বরং বর এবং কনেকে ডেকে আনুন। আমি ওদের সাথে একটু কথা বলবো।

মোর্শেদ এবং উষা সহজ ভঙ্গিতে তার সামনে এসে দাঁড়ালো।
রসুল মোর্শেদের দিকে তাকিয়ে পরিচিতের হাসি হাসলো। কিছু মনে করবেন না মিঃ মোর্শেদ, ডিউটি ইজ ডিউটি। তা ইনিই কি মিস উষা সিদ্দিক?

উষা কঠিন গলায় শুধরে দিলো, জ্বি না মিসেস উষা মোর্শেদ।
তাতো বটেই, তাতো বটেই। তবে আপনার বাবা–মা বললেন ...

জব্বার চেচিয়ে উঠলেন, কি রসুল সাব মাইয়া নিজের মুখে কি বললো, শুনলেন তো ...
রসুল হাসলেন, সব শুনেছি। মেয়ে সাবালিকা। আমার আর করার কিছু নেই। তবুও মেয়ের বাবা মাকে শান্ত করন। রসুল চলে গেলেন।

পরদিন সকাল দশটার দিকে ছটি বিশালাকৃতি মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে সিদ্দিকের বাসায় হাজির হলেন সস্ত্রীক জব্বার। সিদ্দিক একেবারেই বোকা বনে গেলেন।
আরে জব্বার তুই। ব্যাপার কি? এতো মিঠাই মণ্ডা কি জন্যে?
জব্বার আশৈশব বন্ধু এবং ব্যবসায়িক শত্রু র পিঠে তার দশাশই হাতের একটি চাপড় কষলেন।
আরে ব্যাটা, তুই কি আমারে তোর লাহান পাগল–ছাগল মনে করছস নি, অ্যা? অনেক ভাইবা–চিন্তা দ্যাখলাম, পোলায় আর মাইয়ায় মিইল্যা যহন শাদী কইরাই ফালাইছে তহন অগোরে ফালতু কষ্ট দেওনের কোন মানে নাই। তাই তর লগে সন্ধি করবার আইলাম। কেসটা তুইল্যা ল, অগোরে বাড়ি লইয়া আহি।

সিদ্দিক গম্ভীর মুখে বললেন, কেন তুলে নিতে বললেই তুলবো নাকি? তোর ছেলের গণ্ডামীর কথা আমি ভুলে গেছি ভেবেছিস? সেবার যখন আমার লোকজনদের মাথা চেছে নেড় বেল করে দিলো, তখনও তুই মিষ্টি কথা বলে ভজিয়ে ফেলেছিলি। এবার আমি আর কোন কথাতেই ভুলছি না।
জব্বার প্রবল অনুরাগ নিয়ে বন্ধুকে আলিঙ্গন করলেন।
আমার নেংটু কালের দোস্ত তুই, আমার উপর এতো গোসা করস ক্যা? দে পোলাডারে মাফ কইরা। কচি বয়েস, না হয় একটা ভুল কইরাই ফালাইছে ...

সিদ্দিকের পক্ষে আর গম্ভীর থাকা সম্ভব হলো না। তিনি হাসতে হাসতে জব্বারের পেটে দুখানি কড়া জাতের ঘুষি বসিয়ে দিলেন। শালার ব্যাটা, আমাকে গলানোর প্রসেসটা তুই ভালই জানিস। কি বলো রাজিয়া, দেবো ব্যাটাকে মাফ করে?

রাজিয়া তিক্তস্বরে বললেন, মাফ না করে উপায় আছে বলেতো মনে হচ্ছে না। তবে তার আগে আরো খান দুই ঘুষি বসিয়ে দাও, দেখে জ্বালা জুড়াক।
জব্বার নির্লজ্জের মতো হাসতে হাসতে বললেন, আরে চ্যাতন ক্যান ভাবীজান, আমরা হইলাম গিয়া নেংটা কালের দোস্ত।

সবাই মিলিত স্বরে প্রবল বেগে হাসতে লাগলো।